প্র চ্ছ দ
কা হি নী

বিলিভ ইট অর নট

## এই বালুতে আছে

# ১৪৫ লাখ কোটি টাকারও বেশি সম্পদ

রিপোর্ট : **আসাদুর রহমান**

আজকে যে সন্তানটি জন্মাচ্ছে সে কী গর্বিত হতে পারছে বাংলাদেশী হিসেবে? এই প্রশ্ন শুনতেই দেশপ্রেমিকরা রেগে যাবেন নিঃসন্দেহে। কিন্তু অর্থনৈতিক বিষয়টি বিবেচনায় রাখলে উত্তরদাতাকে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়তেই হবে। কেননা তিনি জানেন, এই শিশুটি জন্মাচ্ছে প্রায় ৭২০০ টাকার ঋণ মাথায় নিয়ে। এ হিসাব ১৯৯৯-২০০০ অর্থনৈতিক বছর পর্যন্ত। এ বছর পর্যন্ত বাংলাদেশের অপরিশোধিত বৈদেশিক ঋণ হচ্ছে ৯২ হাজার ৬৬১ কোটি ৫০ লাখ টাকা। এখন এই অঙ্ক আরো বেড়েছে। বাড়ছে মাথাপিছু লোনের পরিমাণও। এসব তথ্য জানলে হতাশা শুধু বাড়েই। কেননা আমরা অর্থনৈতিক মুক্তির কোনো পথই দেখতে পাচ্ছি না। গার্মেন্টস শিল্প, চামড়া শিল্প, চা শিল্প সব কিছুতেই খারাপ অবস্থা। এত অন্ধকারের মধ্যেও সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে এক বিরাট 'গুপ্তধন'-এর খবর। ১৪৫ লাখ কোটি টাকার সম্পদ লুকিয়ে আছে আমাদের দেশে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা বালুতে।

আপনার মনে এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জেগেছে এই দামী সম্পদগুলো কি?

**কী এমন দামী সম্পদ**

পাঠক, আপনার যদি বেড়ানোর সামান্যতম অভ্যেস থাকে, তাহলে এতদিনে নিশ্চয়ই একবারের জন্য হলেও কক্সবাজার বেড়াতে গিয়েছেন। সমুদ্রের নোনা জলে গা ভিজিয়েছেন। গোসল সেরে হোটেল ফেরার পথে আপনি পার হয়েছেন বালুর কিছুটা পথ। আপনার স্মৃতিকে সেই পথে এখন নিয়ে যান। এবার নিশ্চয়ই বালুর মধ্যে কালো একটি অংশ দেখতে পাচ্ছেন। কালো অংশটি কোথাও বেশি, কোথাও বা কম। আপনি যদি কখনো কুয়াকাটা বা নিঝুম দ্বীপ গিয়ে থাকেন তবে নিশ্চয়ই বালির এই কালো অংশটি ভালোভাবে আপনার চোখে পড়েছে। আর বালির এই কালো অংশটিই হলো 'ব্ল্যাক গোল্ড' বা কালো সোনা।

আমাদের এই দেশটিতে এখনও সোনালী রংয়ের সোনা আবিষ্কৃত হয়নি। কিন্তু কালো সোনা রয়েছে লাখ লাখ টন, যার মূল্য সোনার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। খনিজদ্রব্যকে সোনার চেয়ে দামী বলায় নিশ্চয়ই আপনি ভাবছেন সাপ্তাহিক ২০০০ এক গাঁজাখোরি গল্প ফেঁদে বসেছে। রিপোর্টের শুরুতে টাকার যে অংকটির সঙ্গে আপনি পরিচিত হয়েছেন তাতে এমনটি ধারণা হওয়া দোষের কিছু নয়। কিন্তু টাকার এই বিশাল অঙ্কটি যে কোনো আজগুবি গল্প নয় তা বুঝতে পারবেন এ বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞের হিসাব থেকে। এই বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিটি হলেন প্রফেসর লুৎফর রহমান। আমেরিকান জিওলজিক্যাল সার্ভের সাবেক মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। বালু থেকে খনিজ আহরণে তার রয়েছে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা। এ কাজে তিনি আফ্রিকা আর মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে গিয়েছেন। দিনের পর দিন মরুভূমির তপ্ত বালুতে কাজ করেছেন। কক্সবাজার সমুদ্র খনিজ বালু আহরণ সংক্রান্ত কমিটিতে তিনি ১৯৯২ সালে অন্তর্ভুক্ত হন। কমিটির কাজে ১৯৯৩ সালে তৎকালীন আন্তর্জাতিক বাজার দর অনুযায়ী তিনি বাংলাদেশে প্রাপ্ত ব্ল্যাক গোল্ডের বিভিন্ন উপাদানের মূল্য নির্ধারণের জন্য একটি হিসাব করেন। বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় প্রাপ্ত খনিজ বালুর স্তূপগুলোতে প্রাপ্ত খনিজের মাত্র ৩টির আন্তর্জাতিক বাজার দর বের করা হয় তখন। সেই হিসাব অনুযায়ী, জিরকনিয়া

৯৯.৮ ভাগ পরিশোধিত অবস্থায় তার গুঁড়ো দিয়ে যে ধাতু তৈরি করা যায় সেটার বাজার দর প্রতি কেজি ৯০ হাজার টাকা। আমাদের দেশের বালুতে জিরকনের পরিমাণ ১ লাখ ৬১ হাজার ১১৭ টন। এই জিরকন থেকে কম করে ১ লাখ টন জিরকনিয়াম পাউডার তৈরি সম্ভব। সে অনুযায়ী আমাদের দেশের জিরকনের মোট আন্তর্জাতিক বাজার দর ৯ লাখ কোটি টাকা। এরপর তিনি হিসাব কষতে বসলেন ইলমেনাইট নিয়ে। ইলমেনাইটের রাসায়নিক মান টাইটেনিয়াম। তিনি দেখলেন, দেশে আবিষ্কৃত ১৫ লাখ ২৫ হাজার ৫৫৮ টন ইলমেনাইটের মধ্যে পরিশোধিত ৭ লাখ টন টাইটেনিয়াম পাওয়া যাবে যা দিয়ে টাইটেনিয়াম মেটাল রড তৈরি করা যায়। ৯৯.৯% বিশুদ্ধতায় প্রতি কেজি টাইটেনিয়াম মেটাল রডের আন্তর্জাতিক বাজার দর ১ লাখ ৮৩ হাজার টাকা। সে অনুযায়ী ৭ লাখ টন টাইটেনিয়াম ধাতুর বাজার মূল্য প্রায় ১২৮ লাখ কোটি টাকা। দুটি খনিজের আন্তর্জাতিক বাজার দর বের করে তিনি রীতি-

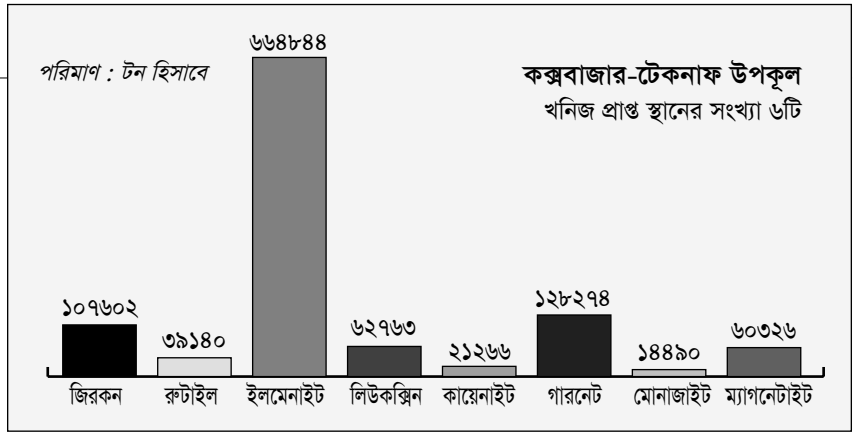


মতো এক ধাক্কা খেলেন। কিন্তু ধৈর্য হারালেন না। এবার হাত দিলেন রুটাইলের আন্তর্জাতিক বাজার দর হিসাবে। বাংলাদেশে প্রাপ্ত রুটাইলের পরিমাণ ৯৮ হাজার ২৭৪ টন। ৯৯.৬% পরিশোধিত অবস্থায় গুঁড়ো রুটাইলের আন্তর্জাতিক বাজার দর কেজি প্রতি পেলেন ২৬০০০ টাকা। রুটাইলের দাম দাঁড়ালো ২ লাখ ৫৫ হাজার ৫শ' কোটি টাকা। ১৯৯৩ সালে হিসাব করা খনিজ তিনটির বাজার মূল্য বর্তমানে আরো বেড়েছে। এছাড়া ব্ল্যাক গোল্ডে আছে আরো ৫টি খনিজ। যার মূল্য কয়েক লাখ কোটি টাকা হবে।

লুৎফর রহমান খনিজগুলোর যে মূল্য দেখিয়েছেন তা প্রায় ১০০% বিশুদ্ধতায়। আমাদের দেশে প্রাপ্ত খনিজগুলোর বিশুদ্ধতায় এই পর্যায়ে নিয়ে যেতে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। তাছাড়া কষ্টসাধ্যও বটে। তবে তা অসম্ভব নয়। শুধু এই তিনটি খনিজই নয়, আমাদের উপকূলীয় বালুতে একই মূল্যমানের গুরুত্বপূর্ণ আরো ৫টি খনিজ রয়েছে যাদের মূল্য কয়েক হাজার কোটি টাকা।

এই কালো সোনা দিয়ে তৈরি করা যায় সুপরিসর বিমান যার কোনো কোনোটির মূল্য হাজার কোটি টাকা। তৈরি হয় কৃত্রিম হার্ট।

# 'কল-কারখানায় ৯০%-এর ওপর আপগ্রেড টাইটেনিয়াম ব্যবহার লাভজনক'

**আ. সা. ও কারনী**
প্রফেসর, বস্ত্র ও ধাতব কৌশল বিভাগ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

***সাপ্তাহিক ২০০০ : বাংলাদেশের ইলমেনাইট কি অবস্থায় রয়েছে?***

**আ. সা. ও কারনী :** আমাদের ইলমেনাইটে আয়রনের পরিমাণ বেশি। ইলমেনাইটের কেমিক্যাল ফর্মূলা হচ্ছে আয়রন অক্সাইড আর টাইটেনিয়াম অক্সাইডের যৌগ। এ দুটোর কম্পাউন্ড হলো ইলমেনাইট। এই আয়রন অক্সাইডটা প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। বাতাস, পানি, তাপ, এগুলো মিলে আয়রন অক্সাইডটা আয়রনের অন্য অক্সাইড হয়। আমাদের ইলমেনাইটে টাইটেনিয়াম অক্সাইডের পরিমাণ কম। এর মধ্যে টাইটেনিয়াম থাকার কথা ৫০%। কিন্তু যেহেতু এখানে অন্যান্য অক্সাইডও আছে, সেহেতু আমাদের টাইটেনিয়াম অক্সাইড পরিমাণ ৪০%-এর কাছাকাছি। টাইটেনিয়াম অক্সাইড ৫৫% যদি না থাকে তবে এর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যবহার একেবারে কম।

***২০০০ : আপনি এ নিয়ে কি ধরনের গবেষণা করেছেন?***

**কারনী :** আমাদের ইলমেনাইটের অবস্থাটা জানার পর টাইটেনিয়াম বাড়ানোর কাজ শুরু করি। কেননা টাইটেনিয়াম ৫৫% যদি করা যায় তবে তা ব্যবহার করা যাবে। আমরা কাজ শুরু করি কিভাবে আয়রন অক্সাইড কমানো যায়। প্রকৃতিতে সব রকম অক্সাইড কিন্তু একরকম stable নয়। কোনো কোনো অক্সাইড সহজে ভেঙে ফেলা যায়। কোনো কোনোটি সহজে ভাঙা যায় না। আয়রনের অক্সাইড টাইটেনিয়াম অক্সাইডের চেয়ে কম stable. আমরা যদি আয়রনের অক্সাইড ভাঙতে পারি, তবে তো আয়রনের পরিমাণ কমবে।

Stable-এর বিষয়টি হচ্ছে, Nature-এ আয়রন মেটাল অবস্থায় থাকে। সেটাই তার Lowest energy অবস্থা। আমি যদি এক টুকরো লোহা বাইরে ফেলে রাখি তাতে মরিচা ধরে যাবে। এবং তা অক্সাইড হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থায় ফিরে যাবে। এটাই হলো প্রকৃতির নিয়ম। আয়রন অক্সাইড একটি দুর্বল অক্সাইড হবার কারণে চেষ্টা করলে আয়রন অক্সাইডটা তাড়তাড়ি ভেঙে ফেলা যায়। আমি যদি এমন একটা কিছু খুঁজে বের করি, যাতে আয়রন অক্সাইড ভাঙলো, টাইটেনিয়াম অক্সাইড ভাঙলো না– তবে টাইটেনিয়াম অক্সাইড বাড়ানোর সুযোগ থাকে। আমি যদি ইলমেনাইটে এডিস সল্যুশনে যাই তাতে টাইটেনিয়াম অক্সাইড ও আয়রন অক্সাইড দুটোই সল্যুশনে যাবে। এতে আয়রন দূর হবে না। কিন্তু যদি আমি আয়রন অক্সাইড ভেঙে মেটালিক আয়রন করি, এতে আমার কিছুটা Energy দিতে হবে, ফলে প্রকৃতিতে আয়রনটা যে অবস্থায় ছিল, তা হতে সে আরো বেশি শক্তি অর্জন করবে। এ মুহূর্তে যদি আমি এসিড সল্যুশনে যাই, তবে আয়রন তাড়াতাড়ি Desolve করবে, টাইটেনিয়াম অক্সাইড Desolve করবে না। ঠিক এই পদ্ধতিই আমরা ব্যবহার করছি। আমরা Char-coal (কাঠ কয়লা) দিয়ে আয়রন অক্সাইডকে ভাঙছি। কার্বন দিয়ে হিট করে আয়রনের অক্সাইডের সঙ্গে কার্বন Re-act করে, কার্বন-মনো অক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস হচ্ছে, আয়রন এতে Free হয়ে যাচ্ছে, তখন থাকছে আয়রন আর টাইটেনিয়াম অক্সাইড। এটাকে যখন আমি এসিড সুল্যশনে যাচ্ছি, তখন আয়রন Desolve হয়ে যাচ্ছে। সে আয়রনটা পরে বের করে আলাদা করে ফেলছি।

এই কাজকে ভিত্তি হিসেবে ধরে প্রথমদিকে আমাদের চিন্তা ছিল যে, কত তাপে, কত সময়ে, কতক্ষণ ধরে হিট করলে আয়রনের অক্সাইড সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ভাঙবে সেটা নির্ণয় করা। প্রথমদিকে আমরা বিভিন্ন তাপে Reduce করার চেষ্টা করেছি। ৯৫০ থেকে ১০৫০–এই তাপমাত্রার মধ্যে একটি উপযোগী তাপমাত্রা আছে, আমরা এই তাপমাত্রায় বিভিন্ন সময় ধরে Reduce করেছি। আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি, সবচেয়ে বেশি Reduction হয় ১০৫০-এ ৪ ঘণ্টায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে লিচিং-এর কাজ করেছি। এতে করে আমরা টাইটেনিয়ামের অক্সাইডের পরিমাণ ৯০% থেকে ৯২% পর্যন্ত পেয়েছি। পরবর্তীতে

এমনকি এই খনিজ দিয়ে তৈরি করতে পারি এটম বোমা, পারমাণবিক চুল্লি। এই কালো সোনা আর কিছুই নয়, কতগুলো খনিজ পদার্থ যা সমুদ্রের বালুর সঙ্গে মিশে থাকে। বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় এলাকা, সমুদ্র সৈকত, দ্বীপাঞ্চলে রয়েছে এই খনিজ বালুর বিশাল বিশাল স্তূপ। বিভিন্ন অনুসন্ধান কাজের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ১৭টি খনিজ বালুর স্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে।

**খনিজের উৎপত্তি**

এত মূল্যবান খনিজ! কি করে এলো আমাদের দেশে। সাপ্তাহিক ২০০০ এই প্রশ্নটি করেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-তত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. আব্দুস সামাদের কাছে। তিনি জানান, সাগরের এই কালো বালু প্রথম আবিষ্কৃত হয় মিশরের নীল নদের তীরে। সাগরের তরঙ্গমালার জোয়ার-ভাটার নিত্য দিনের খেলায়, বাতাসের ক্ষয়ীভবন নগ্নীভবন ক্রিয়ায় সৈকতভূমতে 'প্লেসার' জমা হয়। এ সব খনিজের আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৮৯-এর বেশি। তাই এদের ভূ-তাত্ত্বিক নাম ভারী খনিজ। সাগর তীরবর্তী বা অদূরবর্তী পাহাড়ের

**স্পট : কক্সবাজার**
(খনিজপ্রাপ্ত স্থানের সংখ্যা ১৫টি)

| | |
|---|---|
| কক্সবাজার-টেকনাফ উপকূল | ৬টি |
| মহেশখালী দ্বীপ | ৭টি |
| কুতুবদিয়া দ্বীপ | ১টি |
| মাতারবাড়ী দ্বীপ | ১টি |

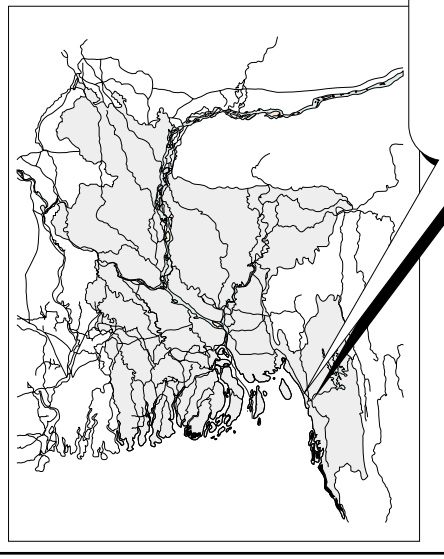

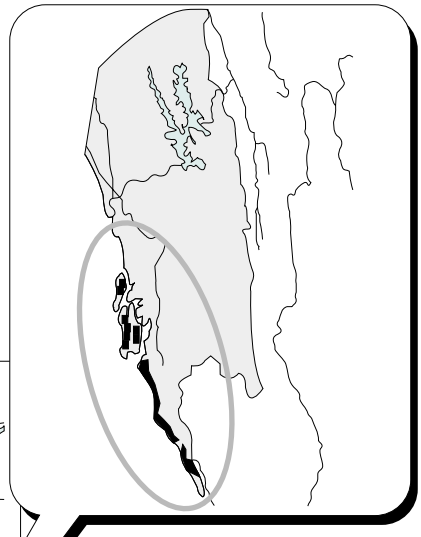

**এই স্পটে প্রাপ্ত খনিজের তিনটি উপাদানের মূল্য**

**ইলমেনাইট** - ১৩১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৭৩৪ কোটি টাকা

**জিরকন** - ৬ লক্ষ ৭২ হাজার ৩৮১ কোটি টাকা

**রুটাইল** - ২ লক্ষ ৪৪ হাজার ২৪০ কোটি টাকা

আমরা দেখেছি, অন্য কিছু মিশ্রণ করলে ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি হয় কিনা। যেমন : আমরা কিছু কার্বনেট মিশিয়ে দেখেছি, যেমন : সোডিয়াম কার্বনেট, পটাশিয়াম কার্বনেট, রেডিয়াম কার্বনেট—এ ধরনের কার্বনেট ব্যবহার করলে আয়রন অক্সাইড ভেঙে যাওয়ার বিষয়টি তাড়াতাড়ি হয়। আমরা লিচিং-এর সময়েও বিভিন্ন এসিড লিচিং করার চেষ্টা করেছি। অন্যদিকে এসিড ফ্রি সল্যুশনে সেটা বের করা যায় কি না তারও চেষ্টা চালাচ্ছি।

***২০০০ : পুরো আয়রন সরিয়ে ফেললে তো আমাদের টাইটেনিয়ামের পরিমাণ কমে যাবে?***

**কারনী :** আয়রন সরিয়ে ফেললে তো মূল ইলমেনাইটের পরিমাণ কমবে কিন্তু টাইটেনিয়াম অক্সাইড কমবে না। যেমন : আমাদের ইলমেনাইটে টাইটেনিয়াম অক্সাইড ৪০%-এর মতো। আমি যদি আয়রন সবটা সরিয়ে ফেলতে পারি, তাহলে ১ কেজি ইলমেনাইট নিয়ে কাজ শুরু করলে ৪০০ গ্রাম টাইটেনিয়াম অক্সাইড পাবো। আয়রন সবটা সরিয়ে ফেলা সম্ভব কিন্তু তাতে যে খরচ হবে তা আমাদের পোষাবে না। তাছাড়া কল-কারখানায় ৯০%-এর ওপর টাইটেনিয়াম ব্যবহার লাভজনক।

***২০০০ : আমাদের ইলমেনাইট দিয়ে কি টাইটেনিয়াম মেটাল তৈরি করা যাবে?***

**কারনী :** টাইটেনিয়াম মেটাল টাইটেনিয়াম অক্সাইড থেকেই তৈরি হয়। টাইটেনিয়াম অক্সাইড হলো টাইটেনিয়াম মেটালের Starting Materials. কিন্তু আমাদের টাইটেনিয়ামের যে পরিমাণ, তাতে টাইটেনিয়াম মেটাল করা লাভজনক হবে না। আমাদের টাইটেনিয়াম পরিমাণ ও গুণগত দিক থেকে তত উন্নত নয়। আমরা ৯২%-এ টাইটেনিয়ামকে নিয়ে গেছি। এই অবস্থায় একে বলা হয় সিনথেটিক রুটাইল। এই অবস্থায় টাইটেনিয়ামকে রং-এর সিনথেটিক পিগমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। অথবা সিরামিক সামগ্রীর গ্লেজিং Materials হিসেবে ব্যবহার করা যায়। কাগজ একেবারে সাদা করতে ব্যবহার করা যায়।

আসলে টাইটেনিয়ামের অক্সাইড ২/৩টি ফর্মে থাকে। রুটাইল, লিউকক্সিন এবং ইলমেনাইট। এদের তিন ভাই বলা যায়। রুটাইলে টাইটেনিয়ামের পরিমাণ ৯৪%-৯৫%, লিউকক্সিনে ৬৫%-৭০%, ইলমেনাইটে Theoretically ৫৫%। কিন্তু আমাদের ইলমেনাইটে কম।

***২০০০ : আপনার গবেষণা অনুযায়ী কোনো কমার্শিয়াল প্লান্ট করতে কত খরচ পড়বে?***

**কারনী :** দিনে ২/৩ টন ইলমেনাইট প্রসেস করা যায় এমন একটি প্লান্ট তৈরি করতে খরচ পড়বে ৫০/৬০ লাখ টাকার মতো। বাংলাদেশে সে নিম্নমানের টাইটেনিয়াম টন প্রতি ৫ হাজার টাকা দরে বিক্রি করে, কিন্তু আমাদের পদ্ধতি ব্যবহার করে অর্থাৎ ইলমেনাইটকে সিনথেটিক রুটাইল করলে তার দাম দাঁড়াবে টন প্রতি প্রায় ৩০ হাজার টাকা।

***২০০০ : সিনথেটিক রুটাইল কি আমরা আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করতে পারবো?***

**কারনী :** আমি তো কোনো অসুবিধা দেখছি না। এখানে একটা প্রশ্ন থাকবে, যদি এতে ক্রোমিয়াম Content বেশি হয়, তবে ক্রেমিয়ামটা কমাতে হবে। কেননা ক্রোমিয়াম থাকলে একটা হালকা সবুজ রং থাকবে। তাতে এটা রং-এর বেজ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। তবে ক্রোমিয়াম কোনো সমস্যা নয়। তা একইভাবে সরানো সম্ভব। কিন্তু আমরা তা এখনও সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারিনি ক্রোমিয়াম কতটুকু আছে, কি আছে। আমরা আগামীতে ক্রোমিয়াম নিয়ে কাজ করবো। তবে ৯২% বিশুদ্ধতায় টাইটেনিয়াম অক্সাইড এমনিতেই ব্যবহার করা যাবে। যেমন : ওয়েলডিং ইলেকট্রোডের ওপর যে কোটিং যাকে ফ্লাক্স কোটিং বলে, সেই কোটিং-এ ব্যবহার করা যায়। এখানে ক্রোমিয়াম বেশি থাকলে কিছু যায়-আসে না।

***২০০০ : ধরুন খানিজ আহরণের এ কাজটি আপনার হাতে দেয়া হলো। আপনি কি কাজ করতে পারবেন?***

**কারনী :** অবশ্যই...। আমরা ত্রিভেন্দ্রমের ওদের কাজ অনুসরণে কাজ করছি। ওরা ব্রাজিল, পেরুতে কাজ করছে। তারা যদি কাজ করতে পারে, তবে আমরা কেন পারবো না।

শক্ত শিলা বাতাসের ঘর্ষণে ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। বিভিন্ন খনিজের যৌগরূপ হলো শিলা। এদের মধ্যে যেমন রয়েছে হালকা খনিজ (যাদের আপেক্ষিত গুরুত্ব ২.৮৯-এর কম) তেমনি রয়েছে ভারী খনিজ। ক্ষয়প্রাপ্ত শিলা থেকে এ সব খনিজ বেরিয়ে পরবর্তীকালে বৃষ্টির পানির সঙ্গে পাহাড়ি নদীতে গিয়ে মেশে। নদীর পানির সঙ্গে তাদেরও যাত্রা শুরু হয় সাগরের দিকে। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে নদীর তরঙ্গ ভারী খনিজকে হালকা খনিজ থেকে আলাদা করতে থাকে। সমুদ্রের স্রোত ও তরঙ্গমালাও এ পৃথকীকরণে সাহায্য করে। এভাবে প্রকৃতির এই ধারাবাহিক ক্রিয়ায় জমা হতে থাকে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক এই খনিজ, যেখানে শিলামধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে খনিজ সঞ্চিত থাকে এবং ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু তাদের পরিবহন ও সঞ্চয়নের পক্ষে অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি করে। এভাবেই রাসায়নিকভাবে অধিকতর নিষ্ক্রিয় ও স্থায়ী ভারী খনিজ টিকে থাকে আর অন্যেরা ভৌতিক ও রাসায়নিক ক্রিয়ায় পরিবর্তিত হয়ে যায় বা পেছনে পড়ে থাকে।

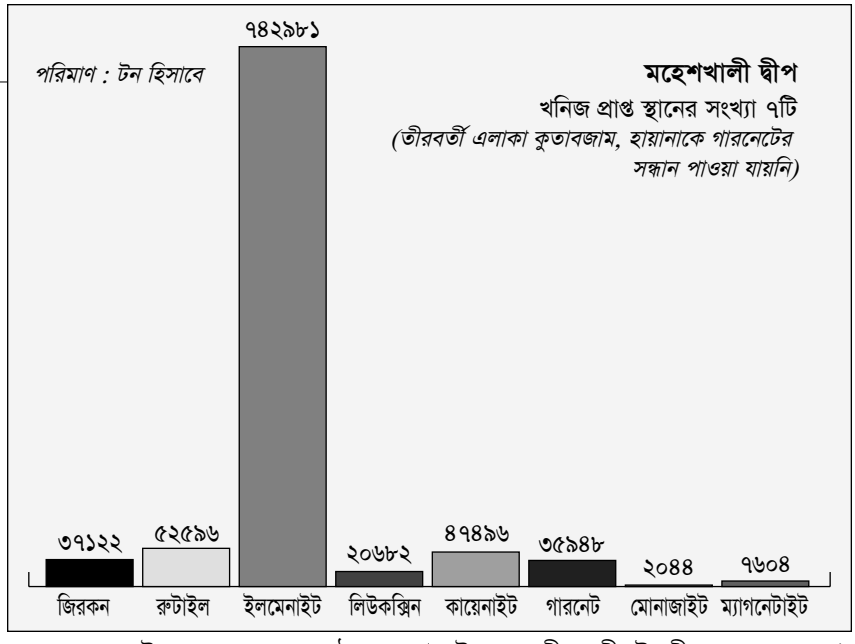


**কোথায় আছে**

কালো সোনার এই স্তূপগুলো সমুদ্র তীরের ১ থেকে ২ মাইল ভেতরে অবস্থান করছে। স্তূপগুলোর শীর্ষদেশ সমভূমি হতে ৫-১০ ফুট এবং মূল সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ১০-১৫ ফুট উঁচু। এই স্তূপগুলোর দৈর্ঘ্য ৫০০-১০০০০ ফুট, প্রস্থ ৫০-১০০০ ফুট আর পুরুত্ব ৩-১৫ ফুট। পৃষ্ঠদেশের নিচে ১০-১৫ ফুট গভীরেও একই বালু রয়েছে। এই ১৭টি স্তূপে মোট বালুর পরিমাণ ২.০৫ কোটি টন। এর মধ্যে ভারী খনিজ বালুর পরিমাণ প্রায় ৪৩.৫ লাখ টন। আর মূল্যবান খনিজ রয়েছে ১৭.৬ লাখ টন। স্তূপ এলাকায় গাছপালা ও জনবসতি কম। স্তূপগুলোর অবস্থানও সুদৃঢ়। ১৭টি স্তূপের মধ্যে ৬টি কক্সবাজার-টেকনাফ উপকূলীয় এলাকায় (বদরমোকাম, সাবরাং, টেকনাফ, শীলখালী, ইনানী এবং কক্সবাজার) মহেশখালী দ্বীপে ৭টি (তীরবর্তী এলাকা, কুতুবজাম, ফকিরাঘোনা, ফকিরাহাটা, বারোগারিয়াপাড়া, পানিরছড়া এবং হায়ানাক)। মাতারবাড়ি ও কুতুবদিয়া দ্বীপে রয়েছে ১টি করে স্তূপ। শুধু ২টি স্তূপ পাওয়া গেছে দেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূলীয় এলাকায়। এদের একটি নিঝুম দ্বীপে অন্যটি কুয়াকাটায়। সোনার চেয়েও দামী এই খনিজগুলোর নাম ইলমেনাইট, জিরকন, রুটাইল, লিউকক্সিন, কায়েনাইট, গারনেট, ম্যাগনেটাইট, মোনাজাইট। প্রাপ্ত তথ্য

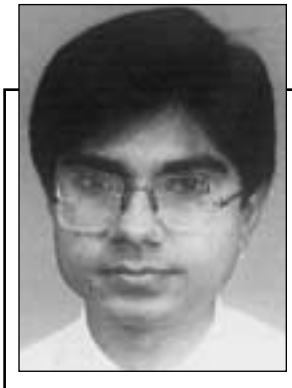

# ‘ফিজিক্যাল সেপারেশনের মাধ্যমেই আমরা বাণিজ্যিক পর্যায়ের সিরামিক গ্লেজ মানের জিরকন পাবো’

**ড. এ. এস. এম. এ হাসিব**
চেয়ারম্যান, বস্ত্র ও ধাতব কৌশল বিভাগ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

***সাপ্তাহিক ২০০০ : জিরকন নিয়ে আপনার গবেষণা কোন পর্যায়ে রয়েছে?***

**ড. এ. এস. এম. এ হাসিব :** আমরা জিরকন নিয়ে কাজ করছি। জিরকনের চারিত্রিক বিশ্লেষণ এবং ব্যবহার এই দুটোর ওপর কাজ হচ্ছে। এর মাধ্যমে আমরা বের করার চেষ্টা করি জিরকনের কেমিক্যাল কমপোজিশন। তার মধ্যে যদি Impurity থাকে, তবে তা কিভাবে আছে সেগুলো বের করা না গেলে তা আমরা যথার্থভাবে ব্যবহার করতে পারবো না। Impurity-র গুণগত ও পরিমাণগত মান যদি জানা থাকে এবং সেটা যদি সহনীয় পর্যায়ে (acceptable limit) নাও থাকে, সেটাকে আমরা দূর করে ব্যবহার করতে পারবো। সে জন্য সবগুলো মিনারেলকে Scientific Investigation করতে হয়। আমরা জিরকনের Indepth Investigation-এর চেষ্টা করেছি, তার ফিজিক্যাল প্রোপার্টিস কেমন, কেমিক্যাল চরিত্র কেমন, তার মিনারোজিক্যাল প্রোপার্টিস কেমন, Impurity কয়টা আছে, কি কি আছে, কিভাবে আছে, আলাদাভাবে আছে নাকি একসঙ্গে মিশে আছে– এই জিনিসগুলো বেশ কিছুটা চিহ্নিত করেছি। একই সঙ্গে সমান্তরালভাবে এর ব্যবহারের দিকেও জোর দিয়েছি। আমাদের কাজটি এখন এমন এক পর্যায়ে রয়েছে যেখানে আমরা বলতে পারি এটি কোথায় কোথায় ব্যবহার করা যাবে। জিরকনের চরিত্র বিশ্লেষণ করার পর দেখলাম এটিকে আমরা সরাসরি কয়েকটি কাজে ব্যবহার করতে পারি, শুধু মাত্র ফিজিক্যাল সেপারেশনের পর। সেগুলো হলো কাস্টিং-এর ক্ষেত্রে, ইস্পাত কারখানায় তাপসহ (refractory) ব্রিক হিসেবে সরাসরি ব্যবহার করা যাবে। যদিও এর মধ্যে কিছু Impurity রয়েছে। ফিজিক্যাল সেপারেশনের পর জিরকনের মধ্যে আমরা যে মূল Impurity পাচ্ছি তা হচ্ছে টাইটেনিয়াম অক্সাইড। এটি ১.৪২% আছে। টাইটেনিয়াম অক্সাইড এই পরিমাণ থাকলে কাস্টিং-এ সেটা কোনো সমস্যা হয় না। সেটাকে আমরা সরাসরি ব্যবহার করেছি গ্লেজিংয়ের ব্যবহারের ক্ষেত্রে। এটা আমাদের দেশে গুরুত্বপূর্ণ। এটা বিদেশ থেকে আনতে হয়। আমরা দেখলাম, টাইটেনিয়াম অক্সাইড থাকার জন্যে রংটা স্যানেটারি হোয়াইট হয় না। একটু ক্রিম রং-এর হয়। সেটা স্যানেটারিতে বর্তমান অবস্থায় সরাসরি কাজে লাগানো না গেলেও সেটার আরো ব্যবহার আছে। টেবিলওয়্যারে সেটা কাজে লাগানো যেতে পারে।

এরপর আমরা কাজে হাত দিয়েছি যে Impurity আছে তা কেমিক্যাল প্রসেসিং রুটের মাধ্যমে দূর করতে। কেমিক্যালি টাইটেনিয়াম অক্সাইড দূর করে আমরা যে গ্লেজ পাই তা কমার্শিয়াল গ্লেজ-এর প্রায় কাছাকাছি। তবে চরিত্র বিশ্লেষণ করার সময় জিরকনের সে চরিত্র দেখেছি, তাতে আমাদের মনে হচ্ছে, ফিজিক্যাল রুট যদি আরো খানিক ভালোভাবে করা যায় তাহলে ঐ টাইটেনিয়াম অক্সাইডকে

অনুযায়ী এদের পরিমাণ-জিরকন ১ লাখ ৬১ হাজার ১১৭ টন, রুটাইল ৯৮ হাজার ২৭৪ টন, ইলমেনাইট ১৫ লাখ ২৫ হাজার ৫৫৮ টন, লিউকক্সিন ৯৫ হাজার ৯৭৯ টন, কায়েনাইট ৯০ হাজার ৭৪৬ টন, গারনেট ২ লাখ ২২ হাজার ৭৫১ টন, মোনাজাইট ১৭ হাজার ৩৫২.৫ টন এবং ম্যাগনেটাইট ৮০ হাজার ৫৯৮ টন। আমাদের বালুতে এই খনিজগুলো কোথাও রয়েছে আলাদাভাবে আবার কোথাও দু'তিনটি একসঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায়।

আগেই বলেছি, এই খনিজগুলো দিয়ে রংয়ের পিগমেন্ট, এরোপ্লেন, এটম বোমা তৈরি করা যায়। আর তাই এগুলোর বিশ্ব বাজারে রয়েছে ব্যাপক চাহিদা।

**কেন বিষয়টি অগোচরে আছে**

এই সম্পদ কী আমরা হঠাৎই আবিষ্কার করেছি? নাহলে কেন হঠাৎ এই আলোচনা। এই সম্পদের হিসাব এতদিন কোথায় ছিল? এসব প্রশ্ন নিশ্চয়ই এতক্ষণে মাথায় এসেছে। বালুতে এই খনিজ সম্পদের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে এসেছে নতুন নয়। ৪০ বছর আগেই এর সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু কোনো এক অজানা কারণে কোনো সময়ই বিষয়টি ঠিক গতিতে আগাতে পারেনি। তারচেয়েও আশ্চর্যের বিষয়, সম্পদের মূল্য নির্ধারণ সরকারিভাবে কখনোই করা হয়নি।

১৯৬১ সালে তৎকালীন পাকিস্তান এটমিক এনার্জি কমিশনের ভূ-তাত্ত্বিকদের একটি দল কক্সবাজারে তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ নির্ধারণ করতে এসে এই খনিজের সন্ধান পায়। এরপর প্রায় ৪০ বছর কেটে গেছে। কিন্তু এনিয়ে এখন পর্যন্তও কার্যকরী কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। মূল্যবান খনিজের সন্ধান পেয়ে তৎকালীন পাকিস্তান আণবিক শক্তি কমিশন এই এলাকার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং ১৯৬৫ হতে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত এই এলাকায় একটি প্রাথমিক জরিপ চালায়। সে বছরই পাকিস্তান আণবিক শক্তি কমিশন ঢাকায় একটি অস্থায়ী অফিস স্থাপন করে যা বছরের শেষ নাগাদ চট্টগ্রামে নিয়ে আসা হয়। ১৯৬৮ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের অনুরোধে অস্ট্রেলিয়ার ডিপার্টমেন্ট অব এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার এলসি নোয়াকস (ব্যুরো অব মিনারেল রিসোর্স, ক্যানবেরা) এবং ইএইচ ম্যাগডোনাল্ড (প্রাইভেট কনসালটেন্ট) কক্সবাজার এলাকায় অনুসন্ধান চালায় এবং একটি রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে স্তূপগুলো মূল্যায়নের জন্যে একট সুপারিশ তৈরি করা হয়।

খনন ও নমুনায়নের কাজে অভিজ্ঞ নোয়াকস এবং ম্যাগডোনাল্ড-এর যৌথ তত্ত্বাবধানে ১৯৬৮ সালে কক্সবাজার এবং টেকনাফে খনন কাজ শুরু হয়। এক বড় পরিমাণ বালু পরীক্ষার জন্যে অস্ট্রেলিয়ার মিনারেল ডিপোজিটস্ লিমিটেডে (এমডিএল) পাঠানো হয় এবং ১৯৭০ সালে এমডিএল-এর ফ্লো-শিট ও সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে পাইলট প্লান্টের জন্যে একটি প্রাথমিক পরিকল্পনা গঠন করা হয়। এদিকে

**স্পট : নোয়াখালী**

(খনিজপ্রাপ্ত স্থানের সংখ্যা ১টি)

নিঝুম দ্বীপ ১টি

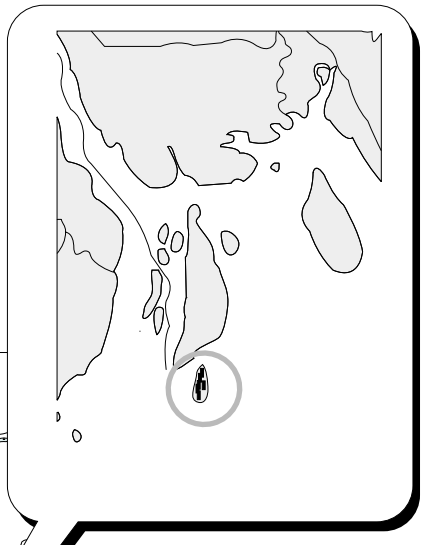

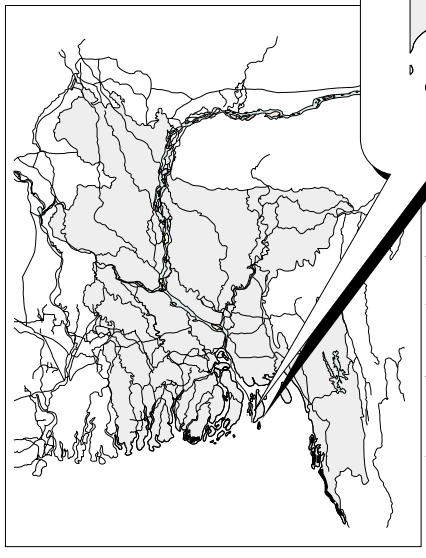

**এই স্পটে প্রাপ্ত খনিজের তিনটি উপাদানের মূল্য**

**ইলমেনাইট** - ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৭৪৮ কোটি টাকা

**জিরকন** - ৯ হাজার ২৩৪ কোটি টাকা

**রুটাইল** - ১ হাজার ১০২ কোটি টাকা

সহজে বাদ দিয়ে দেয়া যায়। সেটা করলে শুধু ফিজিক্যাল সেপারেশনের মাধ্যমেই আমরা বাণিজ্যিক পর্যায়ের সিরামিক গ্লেজ মানের জিরকন পাবো।

***২০০০ : জিরকন বিশুদ্ধকরণে কেমিক্যাল ব্যবহারের কোনো চিন্তা-ভাবনা কি আপনাদের রয়েছে?***

**হাসিব :** জিরকনের মধ্যে রয়েছে জিরকনিয়াম সিলিকেট। এখানে সিলিকেটের পরিমাণ রয়েছে ৩২%। এখানে জিরকন ও সিলিকেট খুব মেশানো অবস্থায় আছে। এটাই হচ্ছে খনিজটির চরিত্র। এখান থেকে যদি সিলিকন একেবারে বাদ দিয়ে দেয়া যায়, তাহলে আমরা জিরকনিয়া পাই। জিরকনিয়া হলো অ্যাডভান্স সিরামিক মেটেরিয়াল।

এটি অনেক উচ্চ তাপমাত্রায় ব্যবহার করা হয়। আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি কিভাবে জিরকন থেকে সিলিকন বাদ দিয়ে জিরকনিয়া বের করা যায়। যদি আমরা তা সঠিকভাবে করতে পারি তবে সেটা খুব দামী হবে। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত মতামত হচ্ছে, এখন আমরা এই পর্যায়ের জিরকনকে যেখানে ব্যবহার করা যায়, সেখানেই ব্যবহার করি। জিরকনিয়া বের করার জন্যে আমাদের আরো বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি লাগবে।

***২০০০ : আমাদের জিরকনে কি তেজস্ক্রিয় কোনো উপাদান আছে?***

**হাসিব :** সব জিরকনের মধ্যেই রেডিও অ্যাকটিভ উপাদান থাকে। রেডিও অ্যাকটিভিটির উপাদানগুলো হলো থোরিয়াম ও ইউরেনিয়াম। আন্তর্জাতিকভাবে এর গ্রহণযোগ্য মান হলো থোরিয়াম ও ইউরেনিয়াম মিলিয়ে এর পরিমাণ ৫০০ পিপিএম-এর কম থাকতে হবে (১ পিপিএম, parts per million হচ্ছে প্রতি দশ লাখ এটমের মধ্যে ১টা এটমের উপস্থিতি) এটি স্বাভাবিকভাবে কম পরিমাণে থাকে। কিন্তু আমরা আণবিক শক্তি কমিশন থেকে যে নমুনা পেয়েছি তাতে থোরিয়াম ও ইউরেনিয়াম দুটোই আছে। এর মিলিত পরিমাণ ১৬০০ পিপিএম-এর কাছাকাছি। এত বেশি পরিমাণে থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। দেশীয় বাজারে এ নিয়ে সমস্যা নেই। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে এই পণ্য বিক্রি হবে না। আমরা এখানে প্রাথমিক টেস্ট করে যা পাচ্ছি তাতে মনে হচ্ছে যে প্রাপ্ত জিরকনের নমুনায় মোনাজাইটের কিছু দানা রয়েছে। এই দানাগুলো যদি ফিজিক্যাল সেপারেশনের মাধ্যমে সরিয়ে ফেলতে পারি তবে সেখানে রেডিয়েশন কমে আসবে বলে আমাদের ধারণা। তাহলে রেডিয়েশনের সমস্যা থাকবে না।

বর্তমানে দেশে গ্লেজ-এর জন্যে ২ মাইক্রোমিটার পরিধির জিরকন ফ্লাওয়ারের চাহিদা রয়েছে। আমরা নতুন কিছু যন্ত্র এনে সেই পর্যায়ে সহজেই যেতে পারবো।

ধারাবাহিকভাবে বদরমোকাম, টেকনাফ, মাতারবাড়ি এবং কুতুবদিয়া দ্বীপে এ সময়ে চলে খনন কাজ। খনন কাজ চলাকালীন ভারি খনিজ আলাদাকরণ, চিহ্নিত করণ এবং খনিজের পরিমাণ নির্ধারণের কাজও একই সঙ্গে চলতে থাকে। কিন্তু ১৯৭১ সালের যুদ্ধে এই কার্যক্রম ভীষণভাবে বাধাগ্রস্ত হয় এবং প্রচুর রেকর্ড হারিয়ে বা নষ্ট হয়ে যায়। ১৯৭২-৭৩ অর্থ বছরে আবার খনন কাজ শুরু হয়। দেশের উপকূলীয় দক্ষিণপূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চল এবং দূরবর্তী দ্বীপ সমূহেও এই কাজ চালানো হয়।

ই এইচ ম্যাগডোনাল্ডের সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন কক্সবাজারে একটি পাইলট প্লান্ট করার জন্যে ১৯৭৩ সালে অনুরোধ জানায় এবং কলম্বো পরিকল্পনার ভিত্তিতে এখানে তাদের সহায়তা বাড়ানোর অনুরোধ জানায়। ১৯৭৩ সালের শেষ দিকে কক্সবাজারের কলাতলীতো পাইলট প্লান্ট তৈরির স্থান নির্ধারিত হয়। কাজও এগিয়ে যায় কিন্তু ১৯৭৬ সালের মার্চ মাসে কাজ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। প্রাথমিক কিছু যন্ত্রপাতির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার সরকার এ খাত হতো তাদের সকল প্রকার সাহায্য উঠিয়ে নেয়– যতক্ষণ না পর্যন্ত এখাতে একটি প্রাথমিক ফিজিবিলিটি-এর কাজ না করা হয়। এই স্টাডিটি অস্ট্রেলিয়ান মিনারেল ডেভেলপমেন্ট ল্যাবরেটরি কর্তৃক পুরস্কৃত হয় ১৯৭৬ সালের মার্চ মাসে এবং এই স্টাডি সম্পন্ন হয় ১৯৭৭ সালের অক্টোবর মাসে।

এ এ এম ডি এল-এর রিপোর্টের ভিত্তিতে অস্ট্রেলিয়ান সরকার এ-খাতে তাদের সব প্রকার সমর্থন প্রত্যাহার করে এবং প্লান্টটি তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে পরমাণু শক্তি কমিশনের কাছে হস্তান্তর করা হয়। নিউক্লিয়ার মিনারেল

# ‘চুক্তিতে রয়েছে ভারী খনিজের ১২% রয়্যালটি দিতে হবে’

**সাইদুল হোসেন**
পরিচালক, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো

সাপ্তাহিক ২০০০ : অস্ট্রেলীয় কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি হওয়ার আগে আপনারা কোনো টেন্ডার আহ্বান করেছিলেন কি?

সাইদুল হোসেন : আমাদের এখানে দেশীয় বা আন্তর্জাতিক টেন্ডারের কোনো নিয়মকানুন নেই। সেহেতু আমরা একটা লিজিং অথরিটি এবং যারা বিনিয়োগ করবে সেই বিনিয়োগগুলো নিয়ন্ত্রণ করা আমাদের দায়িত্ব।

২০০০ : আপনি বলছেন লিজের কাজে টেন্ডারের কোনো নিয়ম নেই। এটাই কি নিয়ম?

সাইদুল হোসেন : এটাই নিয়ম, ব্যুরোর ক্ষেত্রে এই নিয়মই প্রযোজ্য। ১৯৯৫ সালে সে সংশোধিত বিধিমালা করা হয়েছে সেই বিধির শিডিউল ৬-এর রুল ১৬-এর অন্তর্ভুক্ত রুল ৯-এর মাধ্যমে কেউ আবেদন করলে সেটা আমরা গ্রহণ করি। এরপর সেটা একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে পাঠাই। রুল ৯-এর ৫-এর যে ধারা আছে তার যে বিধিমালা আছে সেই বিধিমালার আলোকে যুগ্ম সচিবকে চেয়ারম্যান করা আছে, তিনি এবং একটি ৪ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি আমাদের এখান থেকে প্রসেস করে পাঠিয়ে দেয়া হয় মন্ত্রণালয়ে। মন্ত্রণালয় থেকে তখন তা অনুমোদন দেয়া হয়।

২০০০ : এই নিয়মটি কি সকল কোম্পানির জন্যেই প্রযোজ্য?

সাইদুল হোসেন : যে আসবে তার জন্যেই প্রযোজ্য। তবে এখানে একটা কথা আছে ‘First come First Serve’. আপনি যদি আগে আসতেন তবে আপনাকে আগে দিতাম।

২০০০ : তাহলে কি এখানে কারচুপির একটি সুযোগ থেকে যায় না?

সাইদুল হোসেন : ব্যুরো অব মিনারেলে ভূ-তত্ত্ববিদরা কাজ করেন। তারা তো জানে দেশের কোথায় কি আছে। যেমন, ব্রহ্মপুত্র নদীর লালঘাট এলাকায় যথেষ্ট খনিজ দ্রব্য আছে। সেটা অনেক ভূ-তত্ত্ববিদ জানেন। কিন্তু সেটা আহরণে তো কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এগিয়ে যাচ্ছে না। এখানে এমন একটি ব্যবস্থা রয়েছে যাতে কারচুপির কোনো প্রশ্নই আসে না। কারণ আমরা আবেদন গ্রহণ করছি রুল ৯-এর মাধ্যমে। রুল ৯-এর ৫ ধারা অনুযায়ী তা মন্ত্রণালয়ে পাঠাচ্ছি। আমরা সকল আবেদনই গ্রহণ করবো। যারা আমাদের শর্ত পূরণ করতে পারবে তাদেরই কাজ দেয়া হবে।

২০০০ : দেশী বা বিদেশী অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান কি আপনাদের কাছে আবেদন করেনি?

সাইদুল হোসেন : না কোনো কোম্পানি অনুসন্ধানের কাজে লিজিং-এর জন্য আবেদন করেনি।

২০০০ : কিসের ভিত্তিতে কোম্পানিটির সঙ্গে চুক্তি হয়েছে?

সাইদুল হোসেন : তারা প্রথমে এখানে অনুসন্ধান কাজ চালাবে। খনিজের পরিমাণ নির্ধারণ করবে। ওরা যে প্লান্ট তৈরি করতে যাচ্ছে ১৫/২০ বছর খনিজ থাকলে তবে তা লাভজনক হবে। সে পরিমাণ খনিজ না থাকলে তারা তাদের কাজ আর আগাবে না। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, দেশী যদি কোনো ব্যক্তি মালিকানাধীন কোম্পানি এ কাজে আগ্রহী হয় তবে আমরা তাদের স্বাগত জানাবো। দেশের বিভিন্ন জায়গায় খনিজ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তারা সেখানে কাজ করতে পারে। এই কোম্পানিটিই যে এখানে কাজ করবে সেটাও নিশ্চিত নয়। তারা বিভিন্ন চিহ্নিত এলাকা হতে সংগ্রহ করে ১০০ কেজি বালু'র নমুনা অস্ট্রেলিয়া পাঠিয়েছে। তা বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে– তার যে ফলাফল আসবে সেটা যদি Fisible হয়, তবেই তারা মাইনিং-এর কাজে হাত দেবে।

২০০০ : তারা যদি উত্তোলনের কাজ শুরু করে তবে সেখানে কি হারে তা ভাগাভাগি হবে?

সাইদুল হোসেন : এখানে উৎপাদন বন্টনের কোনো নিয়ম নেই। যখন উত্তোলন শুরু হবে তখন তা রয়্যালটি প্রথার মাধ্যমে হবে। চুক্তিতে রয়েছে ভারী খনিজের ১২% রয়্যালটি দিতে হবে। এই রয়্যালটির হার বিশ্বের যে কোনো অংশের চেয়ে অনেক বেশি। রয়্যালটি বেশি বলছি, কারণ এখানে ৯৫ ভাগ লোক হবে দেশীয়। তাদেরকে বিভিন্নভাবে ট্রেনিং দেয়া হবে। নতুন নতুন টেকনোলজি শেখানো হবে। অন্যান্য দেশ হলে যেমন : ইউরোপীয়ান, আমেরিকান বা নর্থ আমেরিকান কোন দেশ হতো তবে সেই টেকনোলজি তারা শেয়ার করতো না।

২০০০ : পরবর্তীতে চুক্তির ধারা পরিবর্তন হতে পারে কি?

সাইদুল হোসেন : হ্যাঁ, আমরা দেশের স্বার্থে তা পরিবর্তন করতে পারি। যদি আমরা দেখি এটা দেশের জন্য ভালো না তবে আমরা বিধিতে সংশোধন আনতে পারি।

২০০০ : অনুসন্ধান কাজের জন্যে কোম্পানিটি কত টাকা বিনিয়োগ করবে?

সাইদুল হোসেন : ৮০ থেকে ১০৫ মিলিয়ন টাকা তারা অনুসন্ধান কাজে ব্যয় করবে।

২০০০ : কোনো নিয়মবহির্ভূত কাজ তারা করছে কি না সেটা কে দেখবে?

সাইদুল হোসেন : ব্যুরো অব মিনারেল ডেভেলপমেন্ট প্রতিমাসে এক বার গিয়ে তাদের কার্যক্রম দেখে আসবে। তাদের কাজ চালাতে গিয়ে যদি কোনো ক্ষতি হয়, যেমন, যদি উপকূলীয় ভাঙন শুরু হয়, অবশ্যই আমরা তখন অ্যাকশনে যাবো। তারা যা ইচ্ছে তাই করতে পারবে না।

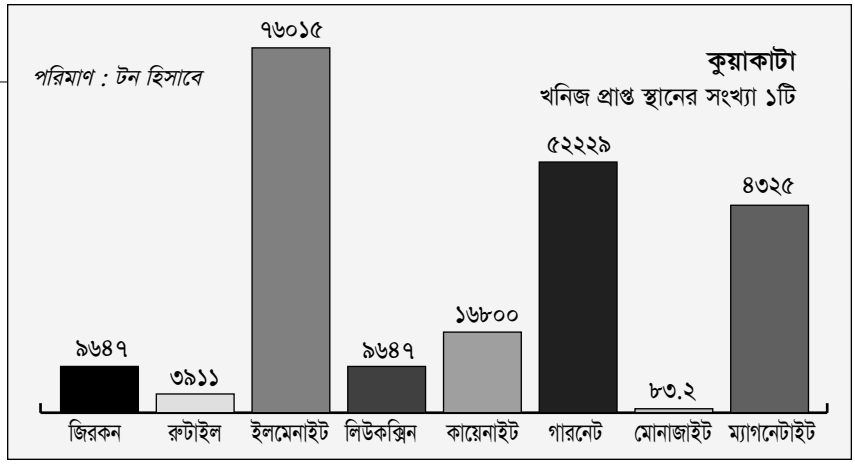


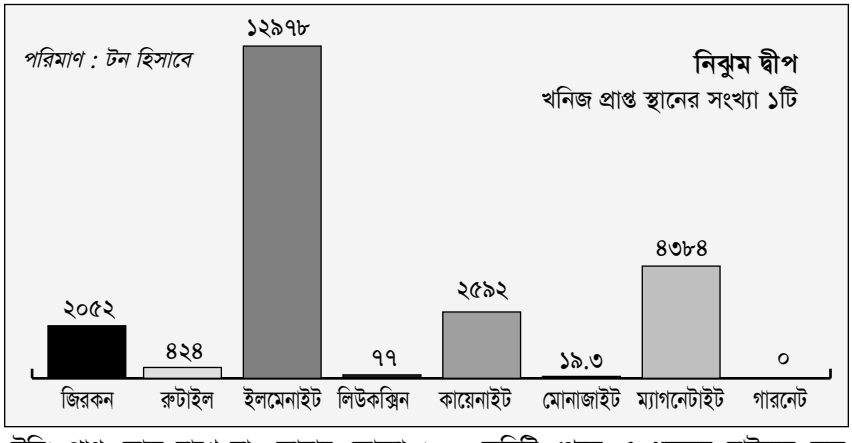


সেন্টারকে ১৯৭৭ সালে নাম পরিবর্তন করে 'বিচ সেন্ড এক্সপ্লোয়েটেশন সেন্টার' নাম করা হয়। ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত এই সেন্টারের কার্যক্রম চলে দ্রুতগতিতে। তৎকালীন সরকার একে প্রাইভেট সেক্টরে দিয়ে দেয়ার চিন্তা ভাবনা করে। কিন্তু বিভিন্ন সমস্যা সামনে এসে দাঁড়ায় যার ফলে '৯১ সাল পর্যন্ত এর কার্যক্রম প্রায় স্থগিত হয়ে যায়। নতুন সরকার এসে গত সরকারের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা খুঁজে দেখতে একটি উদ্যোগ নেয়। '৯১-এর শেষের দিকে সরকার সিদ্ধান্ত নেয় সে সেন্টারটি সরকারিভাবে পরিচালিত হবে এবং '৯২ সালে তার কার্যক্রম আবার শুরু হয়। কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত বালুকায় প্রাপ্ত 'কালো সোনা' ও অন্যান্য মূল্যবান খনিজ সম্পদ আহরণ সংক্রান্ত সমীক্ষা এবং বিশেষ করে কালো সোনার ওপর প্রতিবেদন প্রদানের জন্য সে বছরই একটি কমিটি করা হয়। কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে প্লান্টটি আধুনিক করার উদ্দেশ্যে ১৯৯৩ সালে ডিসেম্বরে এ প্রকল্পের জন্য ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। টাকা পাবার পর পরমাণু শক্তি কমিশন একে তাদের নিজস্ব সম্পত্তি হিসেবে ভাবতে শুরু করে। একে একে বাদ দেয়া হয় কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত কমিশনের বাইরের লোকজনকে। সিদ্ধান্ত হয় এই কোটি টাকা দিয়ে অস্ট্রেলিয়া হতো কিছু আধুনিক যন্ত্রপাতি আনা হবে। যন্ত্রের সঙ্গে সেখানকার কিছু দক্ষ কারিগর আসবেন– যারা এদেশীয় লোকদের বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবেন। কিন্তু ঘটনা ঘটলো তার ঠিক উল্টো। অস্ট্রেলিয়া থেকে তো কোনো এক্সপোর্ট এলোই না, ভারত থেকে ধরে আনা হলো একজন এক্সপার্ট। তার সঙ্গে এলো কিছু শিক্ষানবিস ছাত্র। তারা এসে শুরুতেই একটি মেশিন নষ্ট করে ফেললো। পরে জানা গেল এদের পাঠানো হয়েছে শুধু প্রশিক্ষণ নেবার জন্যে।

এত অনিয়মের পরও তখন কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এ প্রসঙ্গে কমিশনের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের পরিচালক ড: মুনীর আহমদ জানান, এই প্রজেক্টের তৎকালীন ডাইরেক্টর ছিলেন কমিশনের চেয়ারম্যান ড: ওয়াজেদ মিয়া। প্রত্যেক প্রজেক্টের শেষে প্রকল্পের উদ্দেশ্য লক্ষ ও ফলাফল সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট দিতে হয়। কিন্তু এই অনিয়মের জন্যে তিনি তখন কোনো রিপোর্ট দেননি। তিনি অবসর নেয়ার আগেই তা করতে পারতেন।

কাজের অনগ্রসরতার জন্য পরমাণু শক্তি কমিশনকে দায়ী করলেন পাইলট প্লান্টের প্রাক্তন পরিচালক ড. আব্দুস সামাদ। তিনি তার দায়িত্বকালের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'মূল সমস্যা আণবিক শক্তি কমিশনে। তারা কাজটা নিজেরা পারবে না আবার অন্যকেও দেবে না। একবার একে দেবে, একবার ওকে দেবে করছে। তারা প্রতিবছর বাজেট করে কিন্তু ট্রেনিং প্রাপ্ত লোক রাখে না। আবার কোনো লোককে ট্রেনিংও দিচ্ছে না। এটা একটা সেমি কমার্শিয়াল প্ল্যান্ট। এর জন্য কমার্শিয়াল বা পাইলট কোনো অসুবিধাই এখানে নেই। এর ফলে কোনো মিনারেল তারা আলাদা করতে পারছে না।'

যে মিটিং-এ কমিশনকে ৫ কোটি টাকা দেয়া হলো সেখানে বাদ সাধলেন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর আ.সা.ও কারনী। এত টাকা কেন দেয়া হচ্ছে তিনি তার কোনো কারণ খুঁজে পেলেন না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কমিশনের রোষানলে পড়লেন। তার এই মতামতের জন্যে পরবর্তীতে কোনো মিটিং-এ তাকে দাওয়াত দেয়া হয়নি। প্রফেসর কারনী জানান, 'আমরা এ বিষয়ে কোনো কাজ করি তা কমিশন কখনই আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেনি। টাকা পাবার পর এক মিটিং-এ বুয়েট থেকে যে কোনো দু'জন শিক্ষককে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেখানে আমার নাম প্রস্তাব করা হলে তারা বলেন, কারনী এলে তাকে মিটিং-এ ঢুকতে দেয়া হবে না।'

শুধু প্রফেসর কারনীই নন এক এক করে কমিশন সরিয়ে দেয় কমিটির বিভিন্ন সদস্যদের। টাকা পাবার পর স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ থাকার পরও আমেরিকান ডিওলজিক্যাল সার্ভেতে কাজের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রফেসর লুৎফর রহমানকে কমিটি থেকে বাদ দেয়া হয়। মূল্যায়নের অভাবে হারিয়ে যায় ও এইচ কবীর। যার হাতে রয়েছে এক দেশীয় প্রযুক্তি যা দিয়ে অতি অল্প খরচে এই খনিজ উত্তোলন সম্ভব।

কমিটি থেকে এ ধরনের বাইরের দক্ষ লোকদের বের করে দেয়ার ফলে এই খনিজ পরমাণু শক্তি কমিশনের একেবারে নিজস্ব সম্পত্তি হয়ে ওঠে। যতটুকু খনিজ উত্তোলিত হয় তার চলে যথেচ্ছ ব্যবহার। আমাদের দেশে আমদানিকৃত ম্যাগনেটাইটের দাম যেখানে কম করে হলেও ১০০ টাকা সেখানে এই প্লান্ট হতে আহরিত ম্যাগনেটাইট ৯৯% বিশুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বিপুল পরিমাণ ম্যাগনেটাইট মাত্র ৪ টাকা কেজিতে বিক্রি করা হয়েছে।

কমিশন প্রথম থেকেই বলছে, এই খনিজ সংগ্রহ দেশের জন্যে লাভজনক হবে না। অন্যদিকে তারা কাজটি দেশীয় কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকেও দিচ্ছে না। খনিজ সংগ্রহের এই দায়িত্ব ব্যুরো অব মিনারেল ডেভেলপমেন্টের হাতে আসার পর বিষয়টি আরো আড়ালে চলে যায়। ব্যুরো একটি লিজিং অথরিটি, ১৯৯৫ সালের সংশোধিত বিধিমালা অনুযায়ী তারা এ কাজের জন্যে কোনো প্রকার টেন্ডার আহ্বান করতে বাধ্য নয়। আর তাই অনেকটা লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে কক্সবাজার টেকনাফ এলাকার ৬টি স্তূপ তারা লিজ দিয়ে দেয় অস্ট্রেলিয়ার টাইটেনিয়াম রিসোর্সেস লিমিটেড নামক কোম্পানির হাতে।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে দেখা গেছে অস্ট্রেলিয়ার এই কোম্পানির সঙ্গে কি ধরনের চুক্তি হয়েছে সে সম্পর্কে কোনো মহলই অবগত নয়। পরমাণু শক্তি কমিশন, জ্বালানি ও খনিজ মন্ত্রণালয় কেউই চুক্তি সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা দিতে পারেনি।

## আণবিক শক্তি কমিশন-বুয়েট দ্বন্দ্ব

সামুদ্রিক খনিজ বালু নিয়ে অন্য কেউ গবেষণা করুক পরমাণু শক্তি কমিশন তা কখনই চায়নি। তাদের এই মনোবাসনা পূরণ করতে তারা বিভিন্ন কমিটি হতে বারবার দেশীয় গবেষকদের বাদ দিয়েছেন। নিয়েছেন নিজেদের পছন্দনীয় লোক। যারাই কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন তাদেরই কমিটি থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু বাদ সেধেছে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বস্ত্র ও ধাতব কৌশল বিভাগের অধ্যাপক আ.সা.ও কারনী। কমিশন বলছে, কক্সবাজারের পাইলট প্লান্ট-এ ফিজিক্যাল সেপারেশনের মাধ্যমে ৯৬% বিশুদ্ধ ইলমেনাইট সংগ্রহ করা সম্ভব। এতে তারা ম্যাগনেটিক সেপারেশন, ইলেকট্রো স্টেটিক সেপারেশন, গ্রেভিটি সেপারেশন– এই তিন ধরনের ফিজিক্যাল সেপারেশন পদ্ধতি ব্যবহার করবে। কিন্তু প্রফেসর করনী বিষয়টি মেনে নিতে নারাজ। কমিশন যে টাইটেনিয়ামকে ৯৬% বিশুদ্ধ বলছে, প্রফেসর কারনী সেই টাইটেনিয়াম তার পরীক্ষাগারে গবেষণা করেছেন, তিনি সেখানে মাত্র ৪২% টাইটেনিয়াম অক্সাইড পেয়েছেন। প্রফেসর কারনী তার এই মত প্রকাশের পর কমিশনের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। প্রফেসর কারনী সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, আমাদের ইলমেনাইটে আয়রন অক্সাইড ও টাইটেনিয়াম অক্সাইড লেমিনেটেড অবস্থায় আছে। তা ফিজিক্যাল সেপারেশনের মাধ্যমে কোনোভাবেই আলাদা করা সম্ভব নয়। এর জন্যে কেমিক্যাল প্রসেসিং-এ যেতেই হবে। ভারতের বিচ স্যান্ড রিসার্চ ডিভিশন-এর সায়েন্স ল্যাবরেটরির ড. মোহন দাসের যে দলটি ত্রিবান্দ্রমে কাজ করছে, প্রফেসর কারনী একই পদ্ধতিতে তার কাজ এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ড. মোহন দাসের দলটি কেমিক্যাল সেপারেশনের যে রুট ব্যবহার করছে, তিনিও একই রুট ব্যবহার করছেন। এবং এতে তিনি সাফল্যও পেয়েছেন। প্রফেসর কারনী জানান, তিনি এ পদ্ধতিতে টাইটেনিয়ামকে ৯২% বিশুদ্ধতায় অর্থাৎ সিনথেটিক রুটাইল পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন। আর এই পর্যায়ের টাইটেনিয়ামের দামও বেশি। কিন্তু তার এই গবেষণা কমিশন মেনে নিতে পারলো না। ঘটনার এখানেই শেষ নয়। পরবর্তীতে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের এ সংক্রান্ত কাজে কমিশন বাধা দিতে শুরু করলো। প্রফেসর কারনী জানান, আমরা তো একেবারে ল্যাবরেটরির বিকারে কাজ করছি তাই একবার আমরা সেমি ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেলে কাজ করতে চাইলাম, সেটাও আমরা ত্রিবানদমের ওদেরকে অনুসরণ করার চেষ্টা করি। আমি সাড়ে ৮ লাখ টাকার বাজেট দিয়ে একটি রিপোর্ট মন্ত্রণালয়ে জমা দিই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় শুরুতে তা পাসও করে কিন্তু পরে কমিশন বাগড়া দিয়ে প্রজেক্টের টাকা কমিয়ে দেয়। আমাকে মাত্র ২ লাখ ৭৫ হাজার টাকা দেয়া হয়। তা দিয়ে শুধু কয়েকটা মেশিন কেনা যায়।

সবার এক কথা, 'আমরা কিছুই জানি না। চুক্তি হয়েছে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর সঙ্গে, সেখানে যোগাযোগ করুন'। এখানে উল্লেখ্য যে, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়েরই অংশ। এ প্রসঙ্গে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর কারনী ও হাসিব জানান, চুক্তি হওয়ার আগে তারা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বারবার যোগাযোগ করেছেন। কিন্তু কারো কাছ থেকেই তারা কোনো সদুত্তর পাননি।

### কী আছে চুক্তিতে

বাংলাদেশ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ ১৯৬৮ (সংশোধিত ১৯৯৫) নিয়ম অনুযায়ী বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে দেশী বা বিদেশী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যুরোর নির্ধারিত আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে ব্যুরোর পরিচালকের কাছে 'অনুসন্ধান লাইসেন্স', 'খনি লিজ' ও 'কোয়ারি লিজ' এই তিন ধরনের কাজের জন্যে আবেদন করতে পারে। এই আইনের ভিত্তিতে অস্ট্রেলিয়ার ইন্টারন্যাশনাল টাইটানিয়াম রিসোর্সেস পি.টি ওয়াই লিমিটেড অনুসন্ধান লাইসেন্সের জন্য বাংলাদেশ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর কাছে আবেদন করে। আবেদনের ভিত্তিতে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর সঙ্গে ইন্টারন্যাশনাল টাইটানিয়াম রিসোর্সেস পি.টি ওয়াই লিমিটেড ও বাংলাদেশের এর রেজিস্ট্রিকৃত কোম্পানি, ইন্টারন্যাশনাল টাইটানিয়াম রিসোর্সেস লিমিটেড বাংলাদেশের সঙ্গে ১ বছর মেয়াদি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির শর্তানুযায়ী কক্সবাজারের ৬টি এলাকার ১৪৭০০ হেক্টর জমিতে অনুসন্ধান কাজ চালাবে। চুক্তির আওতায় ৯৫% বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ, বিজ্ঞানী ও কর্মচারী নিয়োজিত হবে। ট্রেনিং প্রদান এই অনুসন্ধান লাইসেন্সের কার্যক্রম বাস্তবায়নের একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান যার মাধ্যমে টেকনোলজি ট্রান্সফার সম্ভব হবে। চুক্তি অনুযায়ী কোম্পানিটি ভারী খনিজ উৎপাদন শুরু করলে খনি মুখে উৎপাদিত ভারী খনিজ মূল্যের ১২% হিসেবে রয়্যালটি দিতে হবে।

ইন্টারন্যাশনাল টাইটেনিয়াম রিসোর্স পি.টি.ই লিমিটেড বাংলাদেশ-এর এক রিপোর্টে জানা যায়, খনিজ উত্তোলন লাভজনক হওয়ায় সম্ভাবনা কম বিধায় ৭২১৩ হেক্টর জমি তারা কিছু সময়ের জন্যে ছেড়ে দিয়েছে। তারা এ পর্যন্ত ১০০ কেজি নমুনা অস্ট্রেলিয়া পাঠিয়েছে পরীক্ষার জন্যে। অস্ট্রেলিয়া থেকে পাঠানো রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে তারা আবারও ছেড়ে দেয়া জায়গায় কাজ শুরু করতে পারে। নির্ধারিত এলাকাকে তারা সম্ভাব্য এলাকা, অধিক প্রত্যাশিত এলাকা এবং সম্পদের সহজলভ্য প্রাপ্তির প্রত্যাশিত এলাকা হিসেবে ভাগ করেছে। এ পর্যন্ত তাদের নির্ধারিত এলাকার কিছু অংশ তারা কিনেও নিয়েছে।

চুক্তি নিয়ে বর্তমানে দেশের বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে। অনেকের ধারণা দেশীয় বিশেষজ্ঞদের কোনো প্রকার মতামত না নিয়েই এই চুক্তি করা হয়। এ প্রসঙ্গে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের বস্ত্র ও ধাতব কৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান ড. এএসএমএ হাসিব জানান, চুক্তির আগে তাদের সঙ্গে কোনো পক্ষ হতেই কোনো যোগাযোগ করা হয়নি। তিনি ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করলে তখন কিছুই জানতে পারেননি। তিনি বলেন, 'হঠাৎ একদিন শুনলাম চুক্তি হয়ে গেছে। পরদিন বিভিন্ন পত্রিকায় খুব ছোট ছোট সংবাদ দেখলাম।'

অস্ট্রেলিয়ানদের সঙ্গে এই সংক্রান্ত কাজে আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা সুখকর নয়।

## 'আমি আমার গবেষণায় দেখিয়ে দেবো এটি বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক'

**ও এইচ কবির**
গবেষক

সাপ্তাহিক ২০০০ : কিভাবে বুঝলেন এই খনিজ গুরুত্বপূর্ণ?

ও এইচ কবির : এটা আমি কাউকে বলবো না। আর এই নিয়েই পরমাণু শক্তি কমিশনের সঙ্গে আমার দ্বন্দ্ব। কমিশন বলে, আমাদের প্রমাণ করে দেখাও। কিন্তু আমার কথা হলো এটা আমি কোনো একক ব্যক্তি বা সংগঠনের লোকের কাছে প্রমাণ করবো না।

২০০০ : এই খনিজ কি বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক?

ও এইচ কবির : কমিশন বলছে এটি বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক নয়, কিন্তু আমার কথা হলো একে প্রাইভেট সেক্টরে ছেড়ে দাও। আমি আমার গবেষণায় দেখিয়ে দেবো এটি বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক। তবে আমি একটি ভুল করেছি। যার জন্য কাজটি এত দূরে পড়ে আছে।

২০০০ : আপনার ভুলটি কি?

ও এইচ কবির : গত বিএনপি সরকারের আমলে আমি যখন প্রধানমন্ত্রীকে এ সংক্রান্ত চিঠি দেই, তখন তিনি বিষয়টি নিয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। একদিন খালেদা জিয়া আমাকে তাঁর অফিসে ডেকে নেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি খুবই আগ্রহী হয়ে বলেন, চলেন আমরা

কক্সবাজার পাইলট প্লান্টের সাবেক পরিচালক ড. আব্দুস সামাদ জানান, '১৯৭৩-এ অস্ট্রেলিয়দের সঙ্গে আমাদের চুক্তি হয়েছিল তারা এখানে অনুসন্ধান চালাবে, আমাদের লোকদের ট্রেনিং দেবে এবং সব মিলিয়ে একটি রিপোর্ট দেবে। কিন্তু তারা তখন কোনো কাজ না করেই দেশে ফিরে যায়, এমনকি মিনারেলগুলো পৃথকও তারা করে যায়নি।'

অস্ট্রেলিয়া একবার বলেছে, এখানের খনিজ উত্তোলন লাভজনক নয় তবে আবার কেন তারা একাজে আগ্রহ দেখাচ্ছে– প্রশ্নটি করা হয়েছিল ইন্টারন্যাশনাল টাইটেনিয়াম রিসোর্স লিমিটেড বাংলাদেশ-এর ডাইরেক্টর (অপারেশন) একেএম শহীদুল হাসানের কাছে। তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, 'যেকোনো খনিজ সব সময় একই মূল্যমানের থাকে না। বিশ্ববাজারে চাহিদা, প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে খনিজগুলোর দাম ওঠা-নামা করে।'

চুক্তি নিয়ে আলোচনাকালে প্রফেসর লুৎফর রহমান সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'এটা খুবই একটা ট্রিকি বিজনেস। তারা ভারী খনিজের ১২% রয়্যালটি দেবে। কিন্তু তারা এই খনিজ আপগ্রেড করে তার দাম কয়েকগুণ বাড়িয়ে ফেলবে। আমাদের খনিজের পরিমাণ বেশি নয়। এই হারে রয়্যালটি আমাদের জন্য কোনো লাভজনকই হবে না। আপগ্রেড-এর একটা মাত্রা ঠিক করে সেখান থেকে আমাদের রয়্যালটি ধরা প্রয়োজন।'

অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে চুক্তির পর পরমাণু শক্তি কমিশনের ভূমিকা কি হবে জানতে চাইলে কমিশনের ফিজিক্যাল সাইন্স ডিভিশন-এর ডাইরেক্টর মুহাম্মদ মুসা জানান, 'এখানে অন্যান্য খনিজের সঙ্গে মোনাজাইট রয়েছে। মোনাজাইট একটি রেডিও একটিভ ধাতু। আর সেজন্য এখানেও আমাদের অংশগ্রহণ থাকবে।'

অস্ট্রেলিয়ান কোনো কোম্পানির কাছ থেকে এই সম্পদের বিষয়ে কখনই সঠিক হিসাব পাওয়া সম্ভব নয় বলে জানান একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি জানান, 'বিশ্বব্যাপী ব্যবসাটি নিয়ন্ত্রণ করছে অস্ট্রেলিয়ানরা। তারা কখনোই চাইবে না এই বাজারে তাদের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী আসুক। এজন্যই তারা সব সময়ই বলবে বাংলাদেশে তেমন কোনো সম্পদ নেই।'

**স্পট : পটুয়াখালী**

(খনিজপ্রাপ্ত স্থানের সংখ্যা ১টি)

কুয়াকাটা ১টি

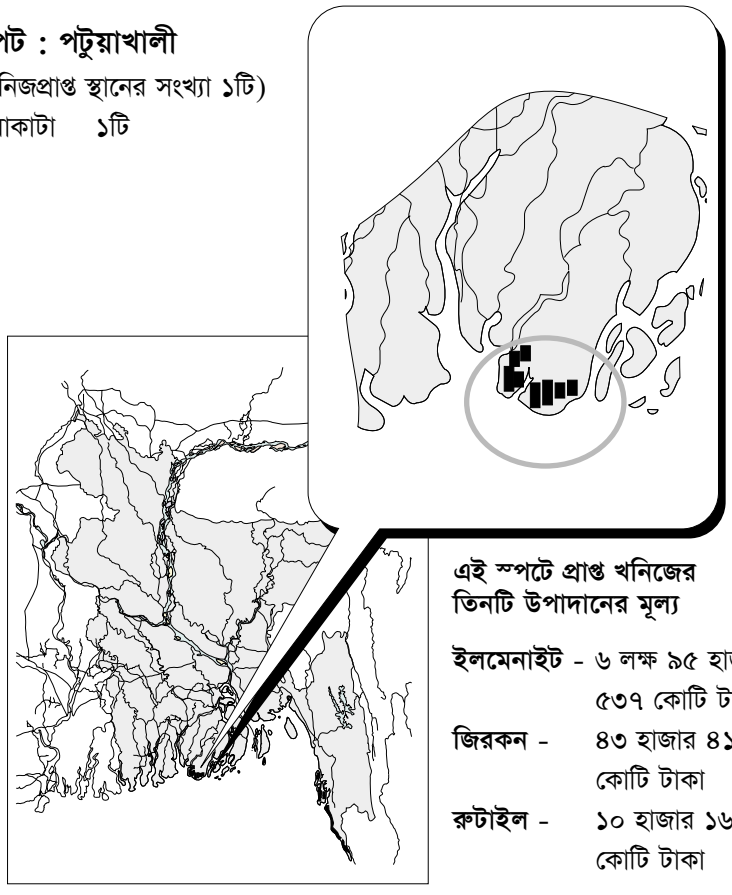

**এই স্পটে প্রাপ্ত খনিজের তিনটি উপাদানের মূল্য**

**ইলমেনাইট** - ৬ লক্ষ ৯৫ হাজার ৫৩৭ কোটি টাকা

**জিরকন** - ৪৩ হাজার ৪১১ কোটি টাকা

**রুটাইল** - ১০ হাজার ১৬৮ কোটি টাকা

**আমাদের কী লোকবল নেই**

হেলিকপ্টারে ঘুরে সাইটটা দেখে আসি। আমি ভাবলাম, ভদ্রমহিলা কি বুঝবে, কি করবে না করবে। তাই আমি ওনাকে বললাম, আপনি একটি কমিটি করেন, সেখানে সদস্য হিসেবে আমি থাকবো, আর সেটাই ছিল আমার ভুল। কমিটি করা হলো। এরপর কমিটিতে শুরু হলো ভুল ভ্রান্তি। আমাকে করা হলো অবহেলা। প্রথম মিটিং-এ নাম, ঠিকানা ভুল করে আমার উদ্দেশে একটি চিঠি পাঠানো হলো। আমি বললাম, আমাকে চিঠি সংশোধন করে না পাঠালে আমি মিটিং-এ যাবো না। কিন্তু তারা আমাকে কোন সংশোধনী চিঠি পাঠায়নি।

২০০০ : এরপর হতে আপনি কি কোনো মিটিং-এ যোগ দেননি?

ও এইচ কবির : পরবর্তী এক মিটিং-এ আমাকে আবার ডাকা হলো, আমি গেলাম। বৈঠকের আহ্বায়ক ছিলেন তখনকার জ্বালানি মন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ। বৈঠকে মন্ত্রীর সঙ্গে আমার কথা কাটাকাটি হলো। মন্ত্রী বললেন, কবির সাহেব যা বলছেন তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। মন্ত্রী আমাকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বললেন, আপনি যদি এটা প্রমাণ করতে পারেন তবে আমি আমার ডক্টরেট ডিগ্রি আপনাকে দিয়ে দেবো। মন্ত্রীর এ ধরনের অপমানসূচক কথায় আমি আহত হলাম। কিন্তু পরবর্তীতে আমি আমার গবেষণা দেখানোর কোনো উপযুক্ত সুযোগ পাইনি। '৯৩তে সাইটটি দেখতে আমরা কমিটির সকল সদস্য আবার কক্সবাজার গেলাম। ফিরে এসে সবাইকে একটি যৌথ রিপোর্ট দিতে বলা হলো। আমি একটি রিপোর্ট দিলাম। কিন্তু আমার রিপোর্ট মন্ত্রী মানতে রাজি হলেন না। তিনি বললেন, সকলে একই মত দিয়ে একটি রিপোর্ট করেন। আমরা সবাই সেটা করলাম। রিপোর্টে সবাই মত দিল এটা ব্যবসায়িকভাবে লাভজনক। ঠিক হলো, আমরা সবাই মিলে রিপোর্টটি প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করবো।

২০০০ : রিপোর্টটি কি প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করা হয়েছিল?

ও এইচ কবির : রিপোর্টকে সামনে রেখে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে মিটিং হলো। মিটিং শেষে খালেদা জিয়া কমিশনের লোকদের বললেন, 'আপনারা কি এটা পারবেন, না পারবেন না'। কাইয়ুম সাহেব ছিলেন তখনকার একাউন্টস্ কমিটির চেয়ারম্যান। তিনি বললেন, আপাতত ৪ কোটি টাকা হলে আমরা কাজ শুরু করতে পারি। সেই মিটিংয়েও জ্বালানি মন্ত্রীর সঙ্গে আমার কথা কাটাকাটি হলো। কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে খালেদা জিয়া বললেন, কবির সাহেব আমরা এখানে ঝগড়া করতে আসিনি। আপাতত তারা ৪ কোটি টাকা চাচ্ছে, আমরা সেটা দিয়ে দেই। যদি না হয় তবে পরে আমরা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবো। পরবর্তীতে শুনেছি সেই টাকা দিয়ে তারা বিদেশে গেছে। গাড়ি কিনেছে, সেখানকার রেস্ট হাউজ আধুনিক করেছে।

২০০০ : বর্তমান বিএনপি সরকারের সঙ্গে আপনি কি যোগাযোগ করেছেন?

ও এইচ কবির : বর্তমান সরকার আসার পর এই কয়দিনে আমি আবার চিঠি পাঠানো শুরু করেছি। প্রেসিডেন্টের কাছেও চিঠি দিয়েছি। কিন্তু উত্তর পেয়েছি দায়সারা গোছের। আমি আর একবারের জন্য খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করতে চাই। তিনি আগে এ বিষয়টি নিয়ে আগ্রহী ছিলেন। আমার বিশ্বাস তিনি এবারও বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখবেন।

# কালো সোনার ৮ রত্ন

**কালো সোনার স্তূপগুলোতে ১৫টির বেশি মূলবান খনিজ রয়েছে। এদর মধ্যে ৮টির উত্তোলন আমাদের জন্যে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক**

**রুটাইল ($TiO_2$) :** রুটাইল হলো একটি টাইটেনিয়াম খনিজ। একে বলা হয় টাইটেনিয়াম ডাই অক্সাইড বা $TiO_2$। এটা টাইটেনিয়াম এবং অক্সিজেনের একটি যৌগ। ইলমেনাইট থেকে আয়রন বাদ দিলে সেটি রুটাইলে রূপান্তর ঘটে। ইলমেনাইটকে আনুমানিক ৯২% বা তার ওপর পরিশোধিত করলে তা সিনথেটিক রুটাইলে পরিবর্তিত হয়। রুটাইল লাল ও কালো মিশ্রিত রংয়ের হয়ে থাকে। রঞ্জক পদার্থের কাঁচামাল, ওয়েল্ডিং রডের বহিরাবরণ এবং টাইটেনিয়াম মেটাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। রঞ্জক পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত রুটাইল হয় অতি বিশুদ্ধ ও সাদা রংয়ের।

**ইলমেনাইট ($FeTiO_3$) :** ইলমেনাইট হলো একটি টাইটেনিয়াম খনিজ। এতে টাইটেনিয়াম অক্সাইডের সঙ্গে আয়রন অক্সাইড মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। এর রং কালো। আমাদের দেশে এই খনিজটি সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। টাইটেনিয়াম মেটাল তৈরিতে ইলমেনাইটের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। অত্যধিক মূল্যমানের এই টাইটেনিয়াম মেটাল এক বিশেষ ধরনের ধাতু। এটি লোহার চেয়ে ৪/৫ গুণ শক্ত কিন্তু ওজনে লোহার চেয়ে অর্ধেক পরিমাণ হালকা হয়। এই ধাতু সহজে ক্ষয় হয় না। এরোপ্লেনের যন্ত্রাংশ তৈরি, গাড়ির বিশেষ কিছু যন্ত্রাংশ, কেমিক্যাল প্লান্টের যন্ত্রাংশ, সার্জিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট তৈরিতে এটি ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া রং কারখানার রঞ্জক পদার্থ, $TiO_2$ তৈরির কাঁচামাল হিসেবে এর একটি বড় চাহিদা রয়েছে।

**লিউকক্সিন ($FeTiO_3.nH_2O$) :** লিউকক্সিন হলো ইলমেনাইটের আর একটি পরিবর্তিত খনিজ, যার মধ্যে কম মাত্রায় আয়রন থাকে। এতে কিছু পানির অণু থাকে। এই টাইটেনিয়াম খনিজটিতে টাইটেনিয়াম, আয়রন, পানির অণু মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। এটি একটি নিম্নমানের রুটাইল যা ওয়েল্ডিং রডের বহিরাবরণের জন্য রুটাইলের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। এটি কালো রংয়ের হয়ে থাকে।

**কায়ানাইট ($Al_2SiO_5$) :** রং-হীন কায়ানাইট একটি এলুমিনিয়াম খনিজ। এতে এলুমিনিয়াম এবং সিলিকা মিশ্রিত থাকে। উচ্চমানসম্পন্ন

৪৯ বছর ধরে পড়ে থাকা এই মূল্যবান খনিজ নিয়ে এমন টালবাহানা দেখে স্বাভাবিকভাবে মনে প্রশ্ন আসতে পারে কেন এতো অবহেলা? বিদেশী কোম্পানির হাতে এই কাজ তুলে দেয়ার মূল কারণ কি দক্ষ জনশক্তির অভাব? উত্তরটি হলো 'না'। আমাদের দেশে খনিজ বালু নিয়ে রয়েছেন অনেক গবেষক।

১৯৭০ সাল। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান পর্যটন কর্পোরেশনের ট্যুরিস্ট অফিসার ও এইচ কবিরের পোস্টিং তখন কক্সবাজারে। একদিন সকালবেলা ছেলেকে নিয়ে তিনি সমুদ্রের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। দেখলেন সমুদ্রের বালুতে একটা কালো অংশ। আগেও দেখেছেন। কিন্তু এবার বিষয়টা তাকে ভাবনায় ফেললো। রুমালে করে কিছু বালু বাসায় নিয়ে এলেন। বালুর মধ্যে কালো অংশ তিনি ঢাকাতেও দেখেছেন। কিন্তু কক্সবাজারের বালুতে অধিক মাত্রার কালো বালু তাকে ভাবিয়ে তুলল। বাসায় এসে ট্রানজিস্টার খুলে তা থেকে চুম্বক বের করে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। বুঝতে পারেন, কক্সবাজারের বালুতে বিপুল পরিমাণ আকরিক লৌহ চূর্ণ ছড়িয়ে আছে।

এরপর থেকে শুরু হয় তার গবেষণা। দীর্ঘ ৬ মাস রাত-দিন খেটে তিনি আবিষ্কার করেন এক দেশীয় পদ্ধতি— যে পদ্ধতিতে অতি অল্প খরচে এই কালো সোনা বা ব্ল্যাক গোল্ড আহরণ ও সদ্ব্যবহার করা সম্ভব।

গত সপ্তাহের এক বিকেলে ওএইচ কবির এসেছিলেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর অফিসে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অসুখ তাকে জেঁকে ধরেছে। হাঁটাচলা করতে হয় খুবই ধীরে। হাতে তার ছোট্ট একটি ব্যাগ। ব্যাগ থেকে ছোট ছোট কয়েকটি পুঁটলি বের করলেন। টেবিলে রাখা সাদা কাগজের ওপর তিনি কিছু কালো গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলেন। গুঁড়োর ওপর একটি ছোট চুম্বক ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে গুঁড়াগুলো চুম্বকের সঙ্গে আটকে গেল। ওএইচ কবির জানালেন এটি তার গবেষণার তৃতীয় ধাপের অংশ। এরপর পরিচয় করিয়ে দিলেন অন্যান্য পুঁটলিগুলোর সঙ্গে। বললেন পুঁটলিগুলোর মধ্যে জিরকন, ইলমেনাইট, রুটাইল, মোনাজাইট আলাদাভাবে রয়েছে। জানালেন, মাত্র ২০-২৫ লাখ টাকা খরচে তিনি এই চারটি খনিজ আলাদা করার প্লান্ট স্থাপনে সক্ষম। কিন্তু কিভাবে তিনি এ কাজ করবেন প্রশ্ন করতেই দ্রুত হাতে পুঁটলিগুলো ব্যাগে ভরে ফেললেন। তার শুধু একটি উত্তর, তিনি এতোদিন তার গবেষণা লুকিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু এখন তার শারীরিক অবস্থা এতো খারাপ যে, যে কোনো মুহূর্তে তিনি মারা যেতে পারেন। তাই কিছুদিনের মধ্যে তিনি বিজ্ঞানী আর সাংবাদিকদের নিয়ে এক প্রেস কনফারেন্স ডাকবেন। সেখানেই তিনি তুলে ধরবেন তার গবেষণা।

শুধু কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতই নয়, বাংলাদেশের সমগ্র উপকূলবর্তী এলাকার বিভিন্ন স্থানে এবং কয়েকটি দ্বীপাঞ্চলে এই আকরিক লৌহযুক্ত বালু রয়েছে। সমুদ্র সৈকত ছাড়াও সমুদ্রের তলদেশেও রয়েছে এই ব্ল্যাক গোল্ডের অস্তিত্ব। কিন্তু আবিষ্কারের পর থেকেই এক অজানা কারণে বারবার ধামাচাপা পড়ে গেছে এই বিষয়টি। আর সে সুযোগে অস্ট্রেলিয়া সারা বিশ্বে করে চলেছে ব্ল্যাক গোল্ডের একচেটিয়া ব্যবসা। পাশ্চাত্য জগতের চাহিদার শতকরা ৯৩ ভাগ বর্তমানে তারাই সরবরাহ করছে। এই ব্লাক গোল্ড এখন অস্ট্রেলিয়ার খনিজ সম্পদের তৃতীয় স্থান দখল করে আছে। অস্ট্রেলিয়ার বালুতে প্রাপ্ত ব্ল্যাক গোল্ডের পরিমাণ যেখানে শতকরা ৫ ভাগ, সেখানে বাংলাদেশের সৈকত বালুতে প্রাপ্ত সেই খনিজের পরিমাণ শতকরা ১৫ ভাগ। এতো ব্যাপক পরিমাণ সম্পদ থাকা

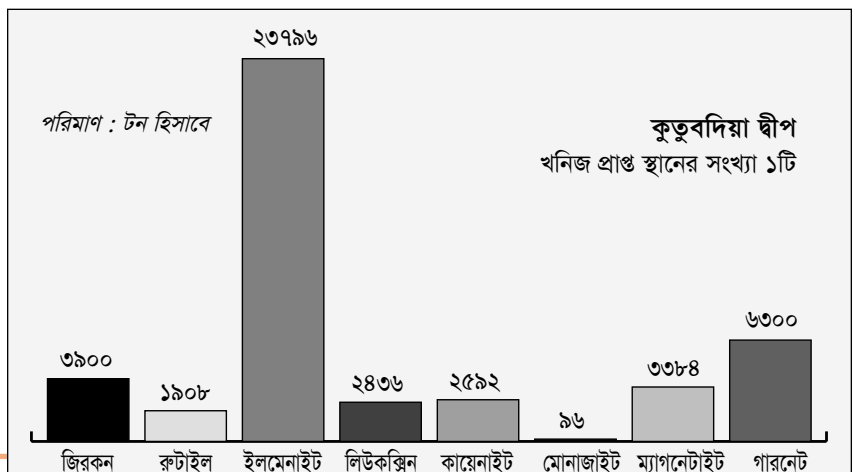

এলুমিনিয়াম দ্রব্য তৈরিতে এটি ব্যবহার হয়। তাছাড়া বিভিন্ন সিরামিক দ্রব্যসামগ্রী তৈরিতে এর ব্যবহার রয়েছে।

**গারনেট (Fe,Al,Ca,Mg,Mn)$(SiO_4)_3$ :** রুক্ষ সামগ্রী হিসেবেই মূলত গারনেট ব্যবহৃত হয়। গোলাপি রংয়ের এই গারনেটে লোহা, এলুমিনিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ম্যাংগানিজ এবং সিলিকা রয়েছে। উন্নত বিশ্বে গারনেট গহনা তৈরিতে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া ঘড়িতে জুয়েল হিসেবেও এর ব্যবহার রয়েছে।

**মোনাজাইট [Th(Ce,La,Y)$PO_4$] :** মধু রংয়ের মোনাজাইট হচ্ছে তেজস্ক্রিয় থোরিয়ামের একটা ফসফেট্ট যৌগ যার মধ্যে কিছু সিরিয়াম, ল্যানথালাম ও ইত্রিয়াম থাকে। মোনাজাইট একটি তেজস্ক্রিয় খনিজ। পারমাণবিক চুল্লিতে জ্বালানি হিসেবে এর ব্যবহার রয়েছে। এটম বোমার কাঁচামাল হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া মোনাজাইট কালার টেলিভিশন ও গ্যাস প্লান্টে ব্যবহৃত হয়।

**ম্যাগানেটাইট ($Re_3O_4$) :** আমাদের দেশের প্রাপ্ত ম্যাগনেটাইটে লোহা আর অক্সিজেন রয়েছে। কালো রংয়ের এই ম্যাগনেটাইট আকরিক লোহা হিসেবে স্টিল কারখানা ও লোহা শিল্পে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন ইলেকট্রনিক যন্ত্রের চুম্বক তৈরির কাজে এর ব্যবহার রয়েছে। পারমাণবিক চুল্লি, এক্স-রে মেশিন হতে বের হওয়া তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ঠেকাতে এটি ঢাল হিসেবে কাজ করে। ম্যাগনেটাইট রংয়ের লাল ও কালো অক্সাইড হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

**জিরকন ($ZrSiO_4$) :** রংহীন জিরকনে জিরকন ও সিলিকার যৌগ। এটি একটি জিরকনিয়াম খনিজ। জিরকন থেকে সিলিকা বাদ দিয়ে তা সিরামিক কারখানায় ব্যবহার করা যায়। জিরকন গয়না তৈরিতে কাজে লাগে। স্টিল কাস্টিং, ইস্পাত কারখানায় তাপসহনীয় ব্রিক হিসেবে জিরকনের ব্যবহার রয়েছে। তাছাড়া পরিশোধিত জিরকনিয়া মেটালের দাম অত্যন্ত বেশি এবং পৃথিবীতে এর চাহিদাও রয়েছে। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়াতে জিরকন দিয়ে সিনথেটিক ডায়মন্ড বানাচ্ছে। যার ১০০ গ্রাম ওজনের ডায়মন্ডের মূল্য ২০০ ডলার।

সত্ত্বেও 'ব্ল্যাক গোল্ড' সংগ্রহের কার্যক্রম গত প্রায় ৫০ বছর ধরে চলছে ধীর লয়ে। এবং সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় হলো, গত বছর জানুয়ারি মাসে 'ব্ল্যাক গোল্ড' খনিজ অনুসন্ধানের পুরো কাজ তুলে দেয়া হয় অস্ট্রেলিয়ার এক কোম্পানির হাতে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এ নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা করেছেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-তত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের প্রফেসর ড. সৈয়দ শামসুদ্দিন আহমেদ কক্সবাজারের খনিজ বালু নিয়ে ভারতে গবেষণা করেছেন। তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, 'বাংলাদেশের ইলমেনাইটে আয়রন অক্সাইড ও টাইটেনিয়াম অক্সাইড লেমিনেটেড অবস্থায় রয়েছে। তবে তা আলাদা করা সম্ভব। এতে খুব একটা খরচও হবে না।' ড. মামসুদ্দিন কক্সবাজারের খনিজ বালু নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী। দেশের স্বার্থে তিনি প্রয়োজনে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করতে রাজি আছেন। তিনি জানান, কিছু যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে কিনতে হবে। সেসব যন্ত্রপাতির সঙ্গেও তিনি পরিচিত আছেন। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হাসিব জানিয়েছেন, তিনি জিরকনকে বিশুদ্ধতার এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গেছেন যে পর্যায়ের জিরকন কাস্টিং, ইস্পাত কারখানায় তাপসহ ব্রিক হিসেবে ব্যবহার করা যায়। একই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর কারনী ইলমেনাইট নিয়ে গবেষণা করছেন। তিনি ইলমেনাইটকে বিশুদ্ধতার প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন। ফিজিক্যাল সেপারেশন-এর পর তিনি ইলমেনাইটের মধ্যে ৪০% টাইটেনিয়াম পেয়েছেন। এই ৪০% টাইটেনিয়ামকে তিনি পরিশোধন করে তা ৯২%-এ নিয়ে এসেছেন। এ পর্যায়ের ইলমেনাইট দিয়ে দামী রং-এর পিগমেন্ট, ওয়েলডিং ইলেকট্রোড কোটিং হিসেবে ব্যবহার করা যায়। বাংলাদেশ প্রতিবছর এর থেকেও নিম্নমানের টাইটেনিয়াম আমাদানি করে ৬ থেকে ৭শ' টন। প্রফেসর কারনীর পরিশোধিত টাইটেনিয়ামের বিশ্ব বাজারে টন প্রতি মূল্য রয়েছে কম করেও ৩০ হাজার টাকা। এ ছাড়াও রয়েছেন ওএইচ কবির। যার হাতে রয়েছে এক গোপন দেশীয় প্রযুক্তি, যা দিয়ে তিনি মাত্র ২০ থেকে ২২ লাখ টাকা ব্যয়ে খনিজ উত্তোলনের প্লান্ট স্থাপনের দাবি করেন। তিনি মনে করেন, তার সেই প্লান্ট থেকে বিশুদ্ধ খনিজ আহরণ করা সম্ভব।

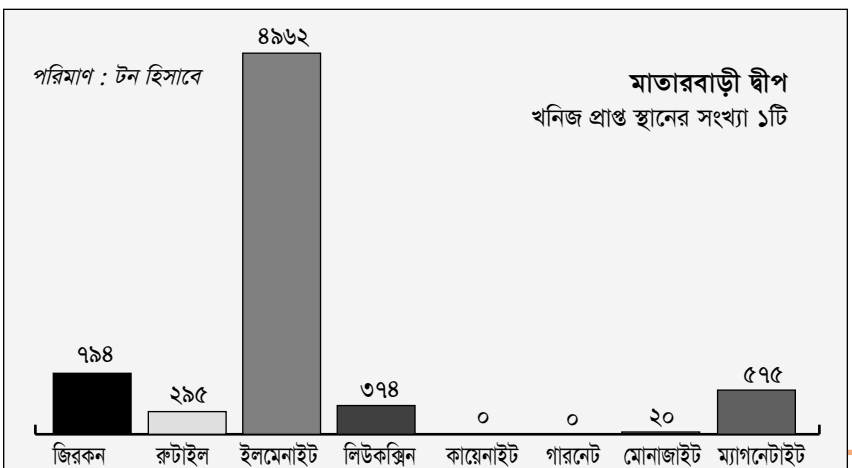


আমেরিকান জিওলজিক্যাল সার্ভেতে কর্মরত অবস্থায় লুৎফর রহমান পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে খনিজ আহরণের কাজ করেছেন। মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশের মরুভূমি তিনি চষে বেড়িয়েছেন। বালু থেকে খনিজ আহরণের কাজে তার মতো বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তি দেশের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ।

লুৎফর রহমান জানান, 'অস্ট্রেলিয়ায় তিনি এই খনিজের একটি রিসার্চ ইনস্টিটিউট দেখেছেন যার পুরোটা চালাচ্ছে বাংলাদেশীরা। বতসোয়ানাতেও দেখেছেন খনিজ আহরণে প্রচুর বাংলাদেশী কাজ করছেন। আমি তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা নিজের দেশের সমুদ্র বালু থেকে খনিজ উত্তোলন কাজে আগ্রহী। তারা শুধু চায় কাজের একটি সুষ্ঠু পরিবেশ।'

### থাকবে না কোনো ঋণ

শুধু সমন্বয়ের অভাবে মূল্যবান এই সম্পদ এতদিন ধরে অযত্ন, অবহেলায় পড়ে আছে। প্রতিবেদনে আলোচিত প্রত্যেকেই তাদের সাক্ষাৎকারে সমন্বয়ের অভাবকেই তুলে ধরেছেন। তবে কি আগমী দিনগুলোতে এই অমূল্য সম্পদ এভাবেই পড়ে থাকবে? জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী একেএম মোশাররফ হোসেন সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেছেন, তিনি এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছে তার যথার্থতা তিনি যাচাই করে দেখবেন। দেশীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ন হলে বাতিল করে দেবেন চুক্তি। একই সঙ্গে তিনি বলেছেন, এ মাসের মধ্যেই তিনি এ বিষয়ে দেশীয় বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আলোচনায় বসবেন। সমন্বয় গড়ে তুলবেন তাদের মধ্যে। কেননা, টাকার অঙ্কের কারণেই এই সম্পদ নিয়ে কোনো রকম সিদ্ধান্তহীনতা বাংলাদেশের জন্য মঙ্গলজনক হবে না। আর একটি সঠিক সিদ্ধান্ত বদলে দিতে পারে এই দরিদ্র বাংলাদেশের চিত্র। বদলে দিতে পারে আমাদের অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান। প্রতি বছর প্রতি মুহূর্তে অর্থমন্ত্রীকে চিন্তিত থাকতে হবে না। জুন মাসে ১৭ হাজার ৫২৬ কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট দেবার জন্য বিদেশী দাতাসংস্থা আর বিশ্বব্যাংকের কঠিন শর্তের মুখোমুখি হতে হবে না আমাদের।

অনাগত বাংলাদেশী সন্তানটি হয়তো ঋণের বোঝা না নিয়েই জন্মাবে। আমাদের সম্পদ দিয়েই আমরা মিটিয়ে ফেলব সব দেনা।